তৈল বীজের চাষ



তৈল বীজের চাষ

শ্রীঅরুণ কুমার মিত্র, বি. এজি.
প্রাক্তন:ফার্ম সুপারিনটেনডেন্ট
সরকারী বীজ খামার

দি বুক ট্রাস্ট
৫৭/বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭/বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মূল্য : সাড়ে চার টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীসুধাংশু মোহন রায়
নিউ শক্তি প্রেস
১০নং রাজেন্দ্র নাথ সেন লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে ভোজ্য ও ভেষজ তেলের চাহিদা অনুপাতে উৎপাদন অনেক কম। শতকরা ৬০ ভাগ তেল অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়। এই ঘাটতি যাতে পুরোপুরি না হলেও অনেকটা কমিয়ে আনা যায় সে উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ পর্যন্ত যেটুকু সাফল্য গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে সেটা যাতে কৃষকরা কাজে লাগাতে পারেন তার জন্য এই বইটি লেখা হল।

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে চাষ পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে—এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুনকে জানতে পারলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই বইটি লিখতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত "শস্যসাথী", এ. শিবরাজের "ফসলের শারীরবিদ্যা", চিচ্চা সিং-এর "রেজিং ফিল্ড ক্রপ" ও কাকডের লেখা "কৃষি আবহাওয়া বিদ্যা"য় সাহায্য নিয়েছি।

স্টেশন রোড
চুঁচুড়া আর. এস. — লেখক
হুগলী
১৯৮৬

ঃ সূচীপত্র ঃ

চীনাবাদাম

যত রকম তৈলবীজ আছে তার মধ্যে চীনাবাদামের চাষ সবচেয়ে বেশী হয় (শতকরা ৪০%)। মোট উৎপাদনের শতকরা ষাট ভাগ তেল উৎপাদনের কাজে লাগে। সেই কারণে চীনাবাদাম একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই বাদাম তেল মূলতঃ বনস্পতি ঘি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতে এই তেল রান্নার জন্য ব্যবহার করা হয়। চীনাবাদাম বীজে ৪৫% তেল ও ২৬% প্রোটিন থাকে। এক গ্রাম চীনাবাদাম থেকে ৫'৮ ক্যালোরী খাদ্যবস্তু পাওয়া যায়। জৈবিক প্রোটিনের পরিমাণ অন্যান্য খাদ্যবীজের তুলনায় চীনাবাদামেই বেশী থাকে। চিনাবাদামে ভিটামিন-এ, থায়ামিন, রাইবোফ্লেবিন, নিকোটিনিক এসিড ও ভিটামিন-ই আছে। তাছাড়া ফসফরাস ক্যালসিয়াম ও লোহা প্রচুর পরিমাণে আছে। চীনাবাদামের খইল, গো খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এতে শতকরা ৭-৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ১৫ ভাগ ফসফরাস ও ১৫ ভাগ পটাশ আছে। শুঁটি জাতীয় ফসল বলে চীনাবাদামের গাছ মুক্ত নাইট্রোজেনও শিকড়ের সাহায্যে নিয়ে থাকে।

আদিনিবাস ও ভারতে আগমন ঃ

যতদূর জানা যায় চীনাবাদামের আদি বাসস্থান দক্ষিণ এমেরিকার ব্রাজিল দেশে। বেনথাম "ফ্লোরা ব্রাজিলেনসিস্" নামক বইয়ে ৫টি চীনাবাদামের জাতের উল্লেখ করেছেন। পর্তুগীজ ধর্মযাজকগণ ভারতের মালাবার উপকূল অঞ্চলে প্রথমে চীনাবাদাম নিয়ে আসেন।

চাষ এলাকা ঃ বিশ্বের সর্বত্র চীনাবাদামের চাষ হয় না। ভারত, চীন, এমেরিকা ও পশ্চিম এফ্রিকায় এর চাষ হয়। ভারতে মোট চাষ এলাকা ও মোট উৎপাদনে চীনাবাদাম বিশ্বের প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। সারা ভারতে ৭৫'৪৮ লক্ষ হেক্টরে চীনাবাদামের চাষ হয়। ভারতে চীনাবাদামের মোট উৎপাদন ৬৩'৪৭ লক্ষ টন। এই

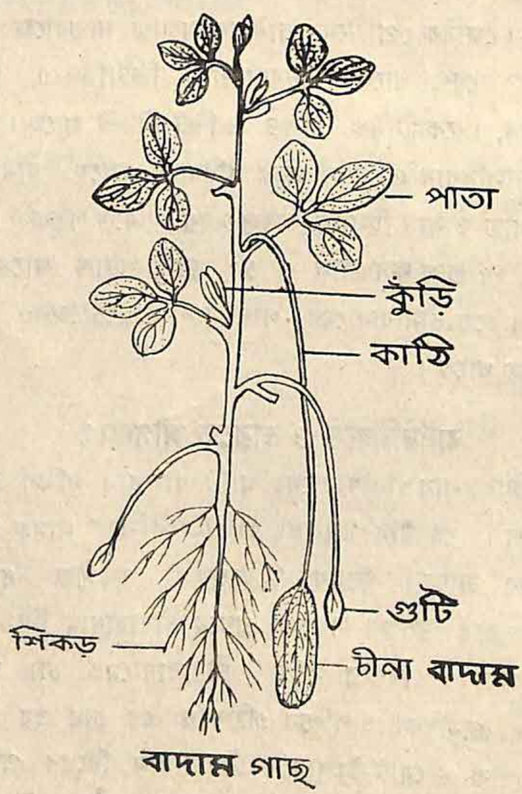
ফসলের চাষ মূলতঃ দক্ষিণ ভারতে বেশী। গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, ও তামিলনাড়ুতে চীনাবাদামের চাষ বেশী হয়। সেই তুলনায় পশ্চিমবাঙলায় চীনাবামের চাষ খুবই কম।

গাছের বিবরণঃ

চীনাবাদাম শুঁটি জাতীয় (পিগুমিনসি) পরিবারের শস্য। এই গাছ দু প্রকারের হয়ঃ

১। সোজা ও ঝাড় জাতীয়। ২। লতান ও ছড়ান।

গাছ সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৬০ সেমি উঁচু হয়। শিকড় মাটির



বাদাম গাছ

অনেক ভিতরে যায়। অনুকূল পরিবেশে জীবাণু সার ব্যবহার করলে শিকড়ে অনেক গুটি বাঁধে। এই গাছের বিশেষত্ব

হল, ফুল ও ফল ধরার পদ্ধতি। ফুলের কুঁড়ি পাতার গোড়ায় হয়। ফুলের পরাগমিলন ঐ ফুলের গর্ভকেশরেই হয়। মিলনের পরে বৃতি পাপড়ি পুংকেশর ইত্যাদি সব ঝরে যায়। ডিম্বের নিকট কাঠির মতন অংশ সৃষ্টি হয় এবং লম্বা হতে থাকে। ঐ কাঠি বড় হতে হতে ডিম্বকে মাটির মধ্যে ঠেলে দেয়, মাটির ভিতরে যাওয়ার পরই কেবল শুঁটি তৈরি হয়। একটি শুঁটিতে ২—৫টি দানা থাকে।



চিনা বাদাম ফুলের অংশ

আবহাওয়া : চীনাবাদাম মূলতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। এই ফসলের জন্য উষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন। এর জীবনকালে প্রায় ৫০০ মিমি বৃষ্টি, প্রচুর সূর্যকিরণ এবং ২১° থেকে ২৬·৫° সেন্টিগ্রেড গড় তাপমাত্রা দরকার হয়। চীনাবাদাম ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না।

মাটি ঃ চীনাবাদাম কেবল হালকা মাটিতেই ভাল হয়। বেলে ও বেলে দো-আঁশ এবং ভাল জলনিকাশী ব্যবস্থা আছে এমন মাটিই ভাল। কারণ হালকা মাটিতে কাঠি সহজে মাটির ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং চীনাবাদামের শুঁটিকে বাড়তে সাহায্য করে। কাটার সময় হালকা মাটি থেকে ফসল সংগ্রহ করা সহজেই সম্ভব হয়। যে মাটি অম্ল বা ক্ষার যুক্ত নয়, সেই মাটিতে চীনাবাদামের চাষ ভাল হয়।

জাত ঃ বি-৩১—এটি ছড়ান জাতের বাদাম। ইহা প্রাক খরিফ (ফাল্গুন-চৈত্র) ও খরিফ (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) দুই মরশুমে লাগান যায়। বীজ বোনা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত সময় নেয় প্রায় ১৩০ দিন। দানা মোটা ও রঙ ইটের মত। হেক্টর (৭½ বিঘা) প্রতি ১৭ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন হয়। এই জাতের বীজ থেকে শতকরা ৫৪ ভাগ তেল পাওয়া যায়।

এম. এইচ-২ ঃ এই জাত বেঁটে ও ভাল ঝাড় হয়। প্রাক্ খরিফ ও খরিফ দুই মরশুমে লাগান যায়। ঘন করে বুনতে হয়। দানা মাঝারি ও লাল রঙের। প্রতি শুঁটিতে ২-৩টা করে দানা হয় ও পাকতে প্রায় ১০৫-১৩০ দিন সময় লাগে। প্রতি হেক্টরে ২৪-২৭ কুইণ্টাল বাদাম পাওয়া যায়। এই জাত থেকে ৫১% তেল পাওয়া যায়। এই দুটি প্রচলিত জাত বাদে জে-১১ ও গোলাচি-১ পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনুমোদিত জাত।

শারীরতত্ত্ব ঃ সূর্যের কিরণ বেশী পেলে গাছ সবুজ হয় ও ফুলে ফলে ভরে যায়।

জমি তৈরী ঃ বাদাম গাছের শিকড় মাটির খুব গভীরে যায়। তবে বাদাম মাটির নীচে হয় বলে জমি তৈরী করার সময় খেয়াল রাখা উচিত যে চাষ খুব গভীর না হয়। গভীর চাষ হলে শুঁটি বা বাদাম মাটির গভীরে চলে যাবে এবং ফসল ওঠাবার সময় অনেক শুঁটি বা বাদাম মাটির ভেতরে থেকে যাবে। মাত্র ১২-১৮ সেমি (৫"-৭") গভীর করে চাষ দেওয়াই ভাল। ৫-৬ বার দেশী লাঙ্গল দিয়ে চাষ

করে মাটি ভাল করে ভুরভুরে করে দিলেই জমির মাটি তৈরী হয়ে যাবে। চৈত্র বৈশাখ মাসে একবার চাষ দিলে জমির আগাছা মরে যাবে। সার প্রয়োগ শেষ চাষের সময় করা উচিত।

বোনার সময়ঃ অসেচ এলাকায় খরিফ খন্দে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বোনা উচিত। সেচসেবিত এলাকায় ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বোনা যায়। তবে জমি তৈরী করতে হলে প্রথমে জমিতে সেচ দিয়ে পরে জমি তৈরী করা ভাল।

বীজ নির্বাচন: সাধারণত ৬০-৭৫ কেজি খোসা ছাড়ান বাদাম এক হেকটর জমির জন্য প্রয়োজন। তবে এম-এইচ-২ জাতের বাদাম বুনলে ১০০-১২০ কেজি খোসা ছাড়ান বাদাম লাগবে। পুষ্ট বীজ হাত বাছাই করে নিলে রোগমুক্ত বীজ পাওয়া যায়। কেজি প্রতি ৩ গ্রাম হিসাবে ব্রাসিকল-৭৫, মানকোজেব বা থাইরাম ইত্যাদি দিয়ে বীজ শোধন করে নেওয়া ভাল, এতে রোগের হাত থেকে ফসলকে বাঁচান সম্ভব হবে, তাছাড়া নতুন জমিতে বাদাম লাগাতে গেলে বীজে রাইজোবিয়াম জ্যাপোনিকাস মিশিয়ে দিতে হবে।

রাইজোবিয়াম ব্যবহার পদ্ধতি ঃ বোনার আগে বীজ কিছু সময়ে জলে ভিজিয়ে রেখে জলটা ফেলে দিতে হবে। এবার ২½ লিটার জলে ৩৭৫ গ্রাম চিটেগুড় মিশিয়ে আধ ঘণ্টার মত ফোটাতে হবে। ফোটান হয়ে গেলে সেটি ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। এবার গুড়ের দ্রবণের মধ্যে ১০০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম দিয়ে ভাল করে নাড়তে হবে। পনের মিনিট পরে বীজে এই দ্রবণ মাখিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর বীজ বুনে দিতে হবে। বীজে সূর্যের তাপ সরাসরি না লাগাই ভাল।

সার প্রয়োগ ঃ বাদাম গাছে নাইট্রোজেন, ফসফোরাস, পটাশ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সালফার প্রচুর পরিমাণে লাগে। তাছাড়া ম্যাঙ্গানীস্ ও বোরনও প্রয়োজন। ভাল দানার জন্য ক্যালসিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে বীজ বা বাদামের সংখ্যা অনেক কম হয়। প্রাক খরিফ মরশুমে সেচ ছাড়া ফসল ভাল হয় না।

তাই সার একসাথে শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ১৫ কেজি নাইট্রোজেন, ৩০ কেজি ফসফেট, ৪৫ কেজি পটাশ প্রতি হেকটর জমিতে দিতে হবে। এই ফসলে চাপান সার দেবার প্রয়োজন হয় না। ক্যালসিয়াম বা চুন জাতীয় পদার্থ ফুল আসার ২০ দিন পরে জমিতে দিলে ফল হতে সাহায্য করে এবং ফলও বেশী ধরে।

বীজ বপন: বাদাম সবসময় সারিতে বুনতে হয়। যে জাতের ঝাড় বেশী হয় তার সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেমি এবং প্রতি সারিতে ১৫ সেমি অন্তর বীজ বুনতে হবে। লতান জাতের জন্য সারির দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি এবং প্রতি সারিতে ২০ সেমি অন্তর বীজ বুনতে হবে। প্রতিটি বীজ ৫ সেমি গভীরে বসাতে হবে।

পরিচর্যা: (১) প্রয়োজনবোধে জমিতে ২ বার নিড়ানী দেওয়া দরকার। প্রথমবার বোনার ২১ দিন পরে এবং দ্বিতীয়টি ৪২ দিন পরে। দানা ধরার সময় কখনই মাটিতে কোদাল বা যন্ত্রপাতি চালান উচিত নয়। ফুল ফোটার আগে বৃষ্টি হয়ে গেলে মাটি আলগা করে দেওয়া দরকার। প্রয়োজনবোধে আগাছা নির্মূল করার জন্য টক-ই ২৫ এই আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

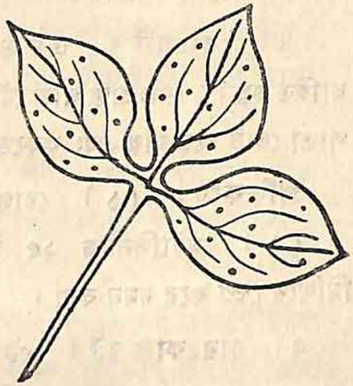
সেচ: বর্ষাকালীন ফসল বলে এর কোন সেচ দরকার হয় না। তবে খরা হলে অন্তত শুঁটি ধরবার সময় একবার সেচ দিতে হয়।

রোগ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার:

১। **অঙ্কুরিত বীজ ও চারা পচা রোগ:** এই রোগ **রাইজোপাস, পেনিসিলিয়াম ও এসপারজিলাম্**—এই তিন প্রকার ছত্রাক থেকে হয়। এই রোগ দেখা দিলে অনেক বীজ অঙ্কুরিত হয় না বা অঙ্কুরিত হলেও পচে যায়। এই কারণে জমি জায়গায় জায়গায় খালি থেকে যায়। বীজ শোধন করে নিলে এই রোগ দেখা দেয় না।

২। **টিক্কা রোগ:** এই রোগ **সারকোসপোরা** নামক ছত্রাক থেকে হয়। ২টি প্রজাতি **মাঃ পারসোনেটা** ও **মাঃএরাডিকি-**

কোলা এই রোগ ছড়ায়। ২২° সেঃ তাপমাত্রার ও আর্দ্রতা বেশী হলে এই রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়, পাতায় ছোট ছোট গোলাকার বাদামী দাগ দেখা দেয়। রোগ বেশী হলে পাতা পড়ে যায়, শুধু ডাঁটা থেকে যায়। ফলন ভাল হয় না বা খুব কম হয়।



টিক্কা রোগগ্রস্থ বাদাম গাছের পাতা

প্রতিকার ও প্রতিরোধঃ (১) থাইরাম জাতীয় ওষুধ দিয়ে বীজ শোধন করা।

(২) রোগগ্রস্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দেওয়া।

(৩) জিনেব ২ কেজি ১০০০ লিটার জলে গুলে এক হেক্টর জমিতে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। অথবা ০.০৫% ব্যাভিস্তিন স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

(৪) রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার কর।

৩। **স্কেলেরিসয়াম রট**ঃ এই রোগ মাটির মধ্যে **স্কেলেরেসিয়াম** রল্‌ফসি নামক ছত্রাক থেকে হয়। এই ছত্রাক দ্বারা গাছ আক্রান্ত হলে গাছের গোড়ায় মাটির কাছে অথবা মাটির ঠিক নীচে সাদা সুতোর মতন ছত্রাক দেখা দেয়। ধীরে ধীরে আক্রান্ত অংশ বাদামী রং ধারণ করে এবং সরষে দানার মতন গুটি দেখা দেয়। পাতা হলদে হয় ও গাছ শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার ও প্রতিরোধঃ (১) আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা।

(২) বীজ ব্রাসিকল ৩% দিয়ে শোধন করা।

(৩) মাটি ছত্রাক দ্বারা বেশী আক্রান্ত হ'লে অন্য ফসলের চাষ

করা যায় না। সেক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে জমিতে ১৫ কেজি ব্রাসিকল জমিতে প্রয়োগ করা দরকার।

৪। **রোসেটি ঃ** এটি ভাইরাস রোগ এবং জাবপোকা দ্বারা বাহিত হয়। রোগগ্রস্ত গাছ বেঁটে হয়ে যায়। খুব বেশী ঝাড় হয়। পাতা ছোট হয়ে যায় এবং কুঁকড়ে শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ (১) রোগগ্রস্ত গাছ দেখামাত্র উঠিয়ে ফেলা।

(২) মেটাসিসটক্স ২৫ ই-সি ১ লিটার, ১০০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করে দমন করা।

৫। **চারকোল রট্ ঃ** এই রোগ ম্যাক্রোফোমিনা ফামিওলি নামক ছত্রাকের জন্য হয়। লালচে-বাদামী রঙের দাগ, ঠিক মাটির উপরে কাণ্ডে দেখা যায়। ঐ দাগ ক্রমশঃ উপরের দিকে ও নীচে শিকড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ (১) জমি গভীরভাবে চাষ করে, কাঠি-কুটি আগাছা ইত্যাদি মাটির নীচে চাপা দিয়ে দেওয়া দরকার।

(২) ব্রাসিকল দিয়ে বীজ শোধন করা দরকার।

(৩) মাটিতে হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি হারে ব্রাসিকল দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দেওয়া।

৬। **মরচে পড়া রোগ ঃ** এই রোগ পাকমিনিয়া এরাকিডিস নামক ছত্রাক দ্বারা হয়। এই রোগ পাতায় দেখা দেয়; পাতায় লাল রঙের ছোট ছোট গুটি দেখা দেয়। পরে এই গুটিগুলো বাদামী রঙের হয়ে ওঠে। গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ (১) গাছের পাতা ডাল ও অন্যান্য অংশ পুড়িয়ে ফেলা।

(২) হেক্টর প্রতি ২ কেজি হারে জিনেব, ১০০০ লিটার জলে গুলে ফসলের উপর স্প্রে করা। প্রয়োজনে স্প্রে ১৫ দিন পরে আর একবার এই ওষুধ দেওয়া দরকার।

বাদাম গাছে নানা ধরনের পোকা লাগে ঃ—

৭। **বাদাম জাব পোকা ঃ** বড় জাব পোকা ও বাচ্চা উভয়েই পাতার রস খায়। তাছাড়া এরা রোসেটি নামক ভাইরাস রোগ ছড়ায়। এরা গাছের সব অংশ এমনকি ফুল ও বাদামেও লাগে। ভাদ্র মাসে সবথেকে বেশী আক্রমণ হয়।

প্রতিকার ঃ আক্রমণ সহ্য করতে পারে এমন জাতের বীজ বোনা। প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার ডেমিক্রন বা মেটাসিসটক্স জাতীয় ওষুধ গুলে স্প্রে করা।

৮। **লিফমাইনর**—গাঢ় বাদামী রঙের মথ ডালের ভেতরে সুড়ঙ্গ করে ডিম পাড়ে। পরে অনেক সবুজ রঙের শুক্কীট পাতার মধ্যে ঢুকে খোল তৈরী করে পাতার সবুজ অংশ খায়। গাছ ভাল করে বাড়তে পারে না ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার ঃ জাবপোকার প্রতিকার দেখুন।

৯। **উই পোকা ঃ** উই পোকা গাছের শিকড় ও ফল খায়। গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ শেষ চাষের আগে ৫% অলড্রিন হেকটর প্রতি ২৪ কেজি হারে জমিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

১০। **সাদা শুককীট ঃ** এই পোকা গুবরে জাতীয়। আষাঢ় মাসে মাটি থেকে বের হয় এবং কয়েকদিন মাত্র বেঁচে থাকে। এই সময় তারা কুল পেয়ারা নিম ও অন্যান্য গাছের পাতা খায় এবং বাদাম ক্ষেতের মাটিতে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে সাদা শুককীট বের হয়। এরা বাদাম গাছের শিকড় খায় এবং আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ উই এর প্রতিকার দেখুন।

১১। **থ্রিপস্ ঃ** বড় ও বাচ্চা উভয়েই নতুন পাতার উপরের দিকে আক্রমণ করে রস শুষে নেয়। আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে যায়। গাছের পাতা সবুজ রঙের বদলে বাদামী হয়ে য়ায়। গাছ শুকিয়ে যায়। বড় পোকা সাদা রঙের হয়। প্রতিকার জার পোকার মতই।

১২। **বিহার শুঁয়ো পোকা ঃ** এই শুয়ো পোকা পাতার নীচের দিকের সবুজ অংশ খেয়ে নেয় ও পাতা সাদা করে দেয়। অনেক সময় গাছের পাতা পড়ে যায়।

প্রতিকার ঃ জাবপোকার মতই।

ফসল কাটা ও ছাড়ান ঃ

সঠিক সময়ে বাদাম তুলে নেওয়া উচিত। অন্যথায় অনেক বাদাম মাটিতে থেকে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণতঃ শুঁটি থেকে পূর্ণ বাদাম হতে ৬০ দিন সময় নেয়। একটি গাছ থেকে যখন পাকা পাতা ঝরে পড়তে থাকে এবং বাদাম হাতের চাপে ভাঙ্গা যায় না তখনই ফসল ওঠাবার উপযুক্ত সময়। সোজা ও ঝাড় জাতের জন্য হাতের টানে গাছ উঠিয়ে নিতে হয়। তাতে বাদাম সহজে উঠে আসে। ছড়ান বা লতান জাতের জন্য কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বাদাম উঠাতে হয়। গাছ উঠিয়ে ৩।৪ দিন জাঁক দিয়ে রাখতে হয়। পরে বাদাম গাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে হয়।

ফলন ঃ উন্নত কৃষি প্রণালী অনুযায়ী যত্ন নিয়ে চাষ করলে হেকটর প্রতি ২০ কুইন্টাল বাদাম পাওয়া যায়। ছড়ান জাতের ফলন ৩০ কুইন্টাল পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব।

ফসল পরিক্রমা ঃ

প্রাক্ খরিফ	খরিফ	শীতকালীন
জোয়ার	বাদাম	গম
ভুট্টা	রেড়ি + বাদাম	ছোলা
জোয়ার	বাদাম	মটর
ভুট্টা	রেড়ি + বাদাম	যব
ধান	বাদাম	ধান

তিল

তিল বিশ্বের অতি পুরাতন তৈল উৎপাদনকারী শস্য। ভারত বিশ্বের তিল উৎপাদনকারী দেশগুলির শীর্ষে এবং মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ তিল ভারতে উৎপন্ন হয়। তিল দানায় ৫০% তেল ও ১৮-২০% প্রোটিন থাকে। ভারতে মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৮ ভাগ তিল তেল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। শতকরা ২.৫ বীজ হিসাবে ও বাকী অংশ পূজা ও অন্যান্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত তেলের শতকরা ৭৩ ভাগ ভোজ্য তেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ৮৩ ভাগ বনস্পতির জন্য ও বাকী অংশ রঙ, ওষুধ ও কীটনাশক দ্রব্য প্রস্তুত করতে লাগে। তিল বীজ ভেজে চিনি বা গুড়ের সাথে মিশিয়ে সুস্বাদু মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরী হয়। দক্ষিণ ভারতে এই তেল সকল প্রকারের রান্নায় ব্যবহৃত হয়। সুগন্ধী মাথার তেল, সাবান ইত্যাদি তৈরী করার কাজে তিলের তেল ব্যবহার করা হয়। তিলের খইল গরীবেরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। তাছাড়া জমির সার ও গোখাদ্য হিসাবেও এর চাহিদা কম নয়। খইলে ৬.০-৬.২ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২.০-২.২ শতাংশ ফসফরাস ও ১.০-১.২ শতাংশ পটাস্ থাকে।

আদিনিবাস ও ভারতে আগমন ঃ

তিল চাষ এই দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। তিল চাষের কথা অথর্ববেদে লেখা আছে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এদেশে সাদা কালো তিলের ব্যবহার ছিল। অনেকের মতে তিলের আদিনিবাস দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। পরে জাভা বোর্নিও ইত্যাদি দেশের মাধ্যমে এদেশে তিলের প্রচলন হয়।

চাষ এলাকা ঃ বিশ্বের তিল উৎপাদনকারী দেশ বলতে ভারত চীন, সুদান, ব্রহ্ম, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা কে বোঝায়। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইটালীতে বর্তমানে তিল চাষের প্রতি বিশেষ জোর

দেওয়া হচ্ছে। ভারত তিলের উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গে তিলের চাষ বেশী হয়। তিল চাষের এলাকা উত্তরপ্রদেশে বেশী হলেও তিলের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করে।

গাছের বিবরণ ঃ

তিল অল্পদিনের ফসল। সাধারণতঃ তিল গাছ ০·৫-১·০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। জলদি জাতের তিল গাছের শিকড় কম ও দুর্বল হয়।



তিল গাছের ডাল

নাবিজাতের তিল গাছের শিকড় মাটির অনেক গভীরে যায় ও সংখ্যায়

বেশী হয়। ফুলের রং সাদা থেকে হালকা গোলাপী হয়, পাতার বোঁটার গোড়ায় ফুল ধরে। ভোরবেলায় সাধারণতঃ ফুল ফোটে এবং স্বমিলন এই ফুলেরই রীতি। ফল লম্বা গুটির আকারের হয়। গুটির মধ্যে অসংখ্য ধূসর রঙের দানা থাকে।

আবহাওয়া : তিল উষ্ণ অঞ্চলে হয় তবে সমতল ভূমি থেকে ১২৫০ মিটার উঁচু জায়গাতেও তিলের চাষ হয়। তিল ঠাণ্ডা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। জল চাপও সহ্য করতে পারে না। বেশী বৃষ্টি হলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। শিলা বৃষ্টি বা ঘনকুয়াশায় ফসলের ক্ষতি হয়। পশ্চিমবঙ্গে তুবার তিলের চাষ করা হয়ে থাকে।

জমি : তিল বিভিন্ন প্রকারের জমিতে চাষ করা যায়, কিন্তু জল-নিকাশী সুবিধাযুক্ত বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটিতে তিল সবথেকে ভাল হয়। বেলে মাটি এবং অম্ল ও ক্ষার জমিতে তিলের চাষ হয় না। তবে সামান্য অম্ল বা ক্ষার জমিতে তিলের চাষ করা চলে।

জাত : পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উপযুক্ত জাত হল :—

বি-৯ : এই জাতের তিল ৮৫-৯০ দিনে পাকে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ লাগাবার উপযুক্ত সময়। বীজের রঙ বাদামী। বীজে প্রায় ৪৭% তেল থাকে এবং ১০ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

বি-১৪ : এই জাত পলিমাটি অঞ্চলের পক্ষে উপযুক্ত। এই জাতের বীজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বপন করা দরকার। এই জাত ৮৫-৯০ দিনে পাকে। বীজে ৪৫% তেল পাওয়া যায় ও ১০ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেয়। বীজের রং কাল।

বি-৬৭ : এই জাতটি সবসময় লাগান যায় এবং ৮০-৮৫ দিনে পাকে। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৮% এবং ফলন প্রায় ১৫ কুইণ্টাল। বীজের রঙ কালচে বাদামী।

এইচ-টি-১ : এই জাতের বীজের রঙ সাদা। সবসময় লাগান চলে। পাকতে ৮০-৮৫ দিন সময় নেয়। এই জাতের তিলে তেলের পরিমাণ ৫১% এবং ফলন ১০ কুইণ্টাল পর্যন্ত হয়।

জমি তৈরী ঃ বীজের দানা ছোট ; এই কারণে জমি খুব ভাল করে তৈরী করতে হয়। বেশ কয়েকবার লাঙ্গল দিয়ে ও মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করতে হবে, জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে।

বীজের হার ও বীজ শোধন ঃ এক হেকটর (৭½ বিঘা) জমির জন্য ৩/৪ কেজি বীজ লাগে। বোনার আগে প্রতি গ্রাম বীজে ব্রাসিকল-৭৫ বা থাইরায়িড, কেজি প্রতি ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

বোনার সময় ঃ তিল চাষ বছরে দুবার হয় ঃ প্রাক খরিফ (ফাল্গুন-চৈত্র) ও খরিফ (জৈষ্ঠ-আষাঢ়)।

সার প্রয়োগ ঃ বিনা সেচে চাষ করলে জমি তৈরীর সময়, শেষ চাষ দেওয়ার আগে হেকটর প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ সার দিতে হবে। সেচসেবিত এলাকার জন্য শেষ চাষের সময় ২৫ কেজি হারে নাইট্রোজেন ফসফেট ও পটাস দিয়ে আরও ২৫ কেজি নাইট্রোজেন প্রথম সেচ দেবার সময় দিতে হবে। চাপান সার সেচের পরে দিতে হবে।

বীজ বপন ঃ তিল সারিতে বোনা ভাল। সারিতে বোনা ফসলের পরবর্তী পরিচর্যা ভাল করে করা যায়, খরচও কম হয়, সারিতে বুনলে প্রতিসারির মধ্যে অন্ততঃ ৪৫ সেমি দূরত্ব থাকা উচিত, প্রতি সারিতে ১৫ সেমি অন্তর বীজ বুনতে হবে। বীজ ১" বা ২ ৫ সেমি গভীরে বুনতে হবে না হলে বীজ ভাল ভাবে গজাবে না। ছড়িয়ে বুনলে অবশ্যই দেখতে হবে যে বীজ যেন মাটির উপরে না পড়ে।

সেচ ঃ তিলের চাষে দুটি সেচের প্রয়োজন হয়। বোনার ৩০ দিন ও ৫০ দিনের মাথায় সেচ দিতে হবে। নরম জমিতে গাছ সহজেই পড়ে যায়। এই কারণে হালকা সেচ দেওয়া ভাল, বিশেষ করে হাওয়া বেশী থাকলে গাছ সহজেই পড়ে যাবে।

পরিচর্যা ঃ সাধারণভাবে মনে রাখা দরকার যে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ৩০-৩২ টির বেশী চারা থাকা উচিত নয়। আগাছা ও বাড়তি

তিল গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে। তিল একেবারে খরা সহ্য করতে পারে না।

শস্যরক্ষা : এই ফসলের প্রধান রোগ 'ফাইলোডি' ও 'লিফকার্ল' (অধিক বৃদ্ধি ও পাতামোড়া)। অধিক বৃদ্ধি সাধারণতঃ প্রায় সব জমিতেই হয়। এই রোগ সাইকোপ্লাজমা জাতীয় জীবাণু থেকে হয় এবং শ্যামা পোকা ও জাব পোকা মারফত রোগ ছড়ায়। প্রতিকারের জন্য ১ মিলিলিটার মেটাসিসটক্স বা রোগর প্রতি লিটার জলে গুলে এক হেকটর জমিতে ৭৫০ লিটার হারে ছড়াতে হবে।

রোগ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার :

কাণ্ড ও গোড়া পচা রোগ : সাধারণতঃ এই রোগ হলে জমিতে ৩-৪ বছর তিল চাষ না করাই উচিত। প্রতিকারের জন্য ডাইথেন-এম-৪৫, ২ কেজি ৭৫০ লিটার জলে গুলে এক হেকটর জমিতে ছিটিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

লেদা পোকা ও বিছা পোকা : পাতা খেয়ে শেষ করে দেয়। প্রতিকার হিসাবে ১ মিলিলিটার মেটাসিড বা একালাক্স প্রতিলিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। এক হেকটর জমিতে ৭৫০ মিলিলিটার এরূপ জলে গোলা ওষুধ ছেটাতে হবে।

ফসল কাটা : যখন পাতা হলুদ হয়ে পড়ে যেতে থাকে ও গুটি হলুদ হয় তখন ফসল কাটা উচিত। নীচের দিকের গুটি আগে পাকে। মাঝামাঝি জায়গায় গুটি পেকে গেলে ফসল কেটে ৩-৪ দিন জাব দেওয়া উচিত। ৩-৪ দিন পরে গুটি থেকে বীজ ছাড়ান উচিত।

রেড়ি

রেড়ি শিল্পের কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ তৈল বীজ। এই ফসলের শিকড় মাটির অনেক গভীরে যেতে পারে বলে খরা পীড়িত এলাকার ফসল পরিক্রমায় এই ফসলের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রেড়ির উৎপাদনে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিশ্বের রেড়ির বাজারে ব্রাজিলের পরেই ভারতের স্থান। রপ্তানি বাণিজ্যে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভারতবর্ষ রেড়ির উৎপাদনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

রেড়ির তেল থেকে রোসনোলীক্ এসিড (৮৫%) পাওয়া যায়। গৃহ-কর্মে, ওষুধ তৈরী করতে ও নানাবিধ শিল্পে এই তেল ব্যবহৃত হয়। রঙ বা বারনিস্ তৈরী করতে এবং মেসিন ভাল ভাবে চালু রাখতে এই তেল লাগে। রেড়ির তেল আলো জ্বালাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া গো-চিকিৎসা ও সার হিসাবে রেড়ির খইল বিশেষ উপযোগী। রেড়ির খইলে গো-খাদ্য হিসাবে অযোগ্য। রেড়ির পাতা কোন কোন অঞ্চলে রেশম কীটের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

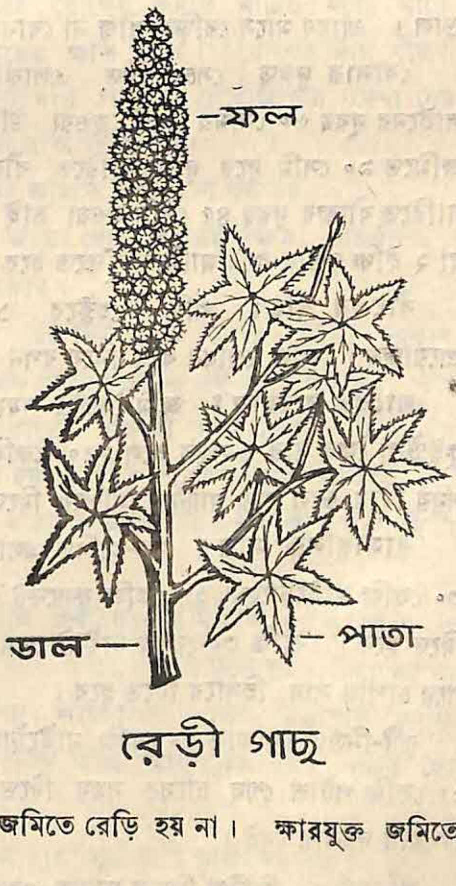
উৎপত্তি ও ইতিহাস :

রেড়ির আদিনিবাস পূর্ব আফ্রিকা এবং সম্ভবতঃ ইউরেপিয়া। সুশ্রুত ও আয়ুর্বেদে রেড়ির উল্লেখ আছে। লাল ও সাদা এই দু ধরনের রেড়ির ব্যবহার ভারতে অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত।

চাষ এলাকা : রেড়ি মূলতঃ উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। খরা সহ্য করতে পারে বলে এর খ্যাতি আছে। সমুদ্রতট থেকে ১৫০০ মিটার উঁচু জায়গায়ও রেড়ির চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে রেড়ির চাষ কম হয়। কিন্তু রেড়ির চাষের জন্য উর্বর জমির দরকার হয় না। এই ফসল ক্ষার জমিতে হয় না। তবে সামান্য অম্ল জমিতে রেড়ির চাষ করা যায়। রেড়ি জল চাপ সহ্য করতে পারে না। অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাটে রেড়ির চাষ বেশী হয়।

গাছের বিবরণ ঃ রেড়ি গাছ সাধারণত বেশ বড় হয়। ৮ মিটার পর্যন্ত উঁচু গাছও দেখা যায়। বেশীর ভাগ প্রজাতির উচ্চতা ৩ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছের উচ্চতা ভেদে পাতা বা কাণ্ডের রং, বীজের রং, আকার, তেলের পরিমাণ ইত্যাদি কম বেশী হয়। গাছের কাণ্ড সোজা উঠে যায়। ছালের রং গাঢ় সবুজ হয় কাণ্ডের দুই পাশেই গাঁট দেখা যায়। প্রতি গাঁটের পাশ থেকে পাতা বের হয়। পাতা গাঢ় সবুজ হয়। পুষ্পগুচ্ছের গোড়ার দিকে পুরুষ ফুল থাকে ও আগার দিকে স্ত্রী ফুল থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ ফুলের সংখ্যা ৪০ ঃ ৬০ ভাগ হয়ে থাকে।

আবহাওয়া ঃ রেড়ি সাধারণতঃ একটু উষ্ণ আবহাওয়া পছন্দ করে। অল্প আর্দ্রতা এবং প্রচুর সূর্যালোক বীজ গঠনে সাহায্য করে। মেঘলা আকাশ ফুলের পরাগ মিলনে বাধা দেয়। রেড়ির শেকড় মাটির অনেক গভীরে যেতে পারে বলে অল্প বৃষ্টিপাত এলাকাতেও ফলন ভাল হয়।



রেড়ী গাছ

জমি ঃ বেলে দো-আঁশ বা দে-আঁশ জমিতে রেড়ি ভাল হয়। এঁটেল মাটি বা জলা জমিতে রেড়ি হয় না। ক্ষারযুক্ত জমিতে এই চাষ করা উচিত নয়।

জাত ঃ পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনুমোদিত জাত, বি-১এ। এই জাতের কাণ্ড লাল হয় ও বীজে কাঁটা থাকে না। গাছ বেশী উঁচু হয় না। বীজ ছাই রঙের এবং বীজে প্রায় ৪৫% তেল থাকে। প্রতি হেক্টরে ১০ কুইন্টাল অব্দি বীজ পাওয়া যায়।

ফসল পর্যায় ঃ রেড়ির পরে জমিতে গম বা তিসি লাগান যায়। মিশ্র ফসল হিসাবে তুলো, বাদাম, অড়হর, ছোলা জোয়ার, বাজরা অথবা বরবটীর সাথে রেড়ির চাষ করা চলে।

বোনার সময় ঃ আষাঢ় মাসের প্রথম পক্ষে বা বৃষ্টি দেরীতে হলে দ্বিতীয় পক্ষে রেড়ি লাগান যায় প্রথম বৃষ্টিতেই রেড়ি বুনে দেওয়া ভাল। শ্রাবণ মাসে রেড়ির বীজ না বোনাই ভাল।

বোনার দূরত্ব : সেচ-সেবিত এলাকায় সেচের সাহায্যে বুনলে লাইনের দূরত্ব ৬০ সেমির বেশী হওয়া উচিত নয়। বৃষ্টি নির্ভরশীল জমিতে ৯০ সেমি দূরে দূরে সারিতে বীজ লাগান উচিত। প্রতি সারিতে বীজের দূরত্ব ৪৫ সেমি হওয়া চাই। বীজ অন্ততঃ ৪ সেমি বা ২ ইঞ্চি গভীর করে মাটিতে পুঁততে হবে।

বীজের হার ঃ প্রতি হেক্টরে ১৮—২০ কেজি বীজের প্রয়োজন। বীজ শোধন করে নিয়ে বপন করা উচিত।

সারের ব্যবহার ঃ জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ১০০—১৫০ কুইন্টাল জৈব সার ও সম্ভব হলে ২৫০ কেজি নিমের খইল শেষ চাষের সময় দিয়ে ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

রাসায়নিক সার ঃ সেচ-সেবিত এলাকায় শেষ চাষে হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ সার দিতে হবে। বাকি ৩০ কেজি নাইট্রোজেন সার বীজ বোনার ৬০ দিন পরে চাপান সার হিসাবে দিতে হবে।

বৃষ্টি-নির্ভর এলাকায় ৩০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ শেষ চাষের সময় দিতে হবে, কোন চাপান সার দেওয়ার দরকার নেই।

পরিচর্যা : তিরিশ দিনের মাথায় একবার ও ৬০ দিনের মাথায়

আর একবার নিড়ানী দেওয়া দরকার। প্রথমদিকে জমি পরিষ্কার রাখলে ফলন ভাল হয়। তাছাড়া মূল ডালটি বাদ দিয়ে শাখা ডালের কুঁড়ি ভেঙে দিলে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে ও ফলন ভাল হয়।

সেচ ঃ রেড়ি বর্ষাকালের ফসল বলে সেচের দরকার হয় না। তবে খরা দেখা দিলে একটা সেচ দেওয়া উচিত।

রোগ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার ঃ

সিডলিং ব্লাইট ঃ এই রোগের ছত্রাক মাটির মধ্যে থাকে। এই রোগ চারা অবস্থায় গাছের ক্ষতি করে। রোগের দাগ বীজপত্র থেকে শুরু হয়। গোলাকার দাগ পাতায় ও বীজপত্রে দেখা দেয়। রোগ বেশী হলে ডগার পাতাও আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার ঃ ১। উঁচু জমিতে এই রোগ কম হয়।

২। রোগ সহনশীল জাত যেমন **টি.-এম. ডি-৯, এইচ-সি-৬** বা পি সি-১ ব্যবহার করা দরকার।

৩। তামাঘটিত ওষুধ ১৫ দিন অন্তর তুবার ছেটান দরকার।

ডালপচা রোগ :—এক ধরনের ছত্রাক এই রোগ ছড়ায়। কাণ্ড, ডাল ও পাতায় ডিমের আকারের বাদামী দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে এই দাগ আকারে বড় হয় ও পরে গাছের ডাল শুকিয়ে যেতে থাকে। ০·৩% থাইরাম ও ০·৩% ডাইথেন, হেড-৭৪ জলে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে।

ধসা রোগ ঃ এই রোগ এক ধরনের ছত্রাক থেকে হয়। এই রোগ গাছের ডগায় বিশেষ করে পাতা, ফুল ও ফলে হয়। রোগের দাগ সর্বত্র দেখা যায়। মেঘলা আবহাওয়া রোগ ছড়াবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আক্রান্ত বীজ আধপাকা হয়। দানা ছোট ও কোঁকড়ান হয়।

প্রতিকার ঃ ১। আগাছা মুক্ত জমি থাকা দরকার।

২। শোধন করা বীজ ব্যবহার করা দরকার।

৩। তামা বা দস্তা ঘটিত ওষুধ ছেটালে রোগ ছড়াতে পারে না।

মরচে রোগ : এই রোগ একপ্রকার ছত্রাক থেকে হয়। ছোট ছোট ধূসর রং-এর দাগ পাতায় দেখা দেয়। এই রোগে ৫০% ফলন কমে যায়।

প্রতিকার : রোগ দেখামাত্র দস্তা ঘটিত ওষুধ ছেটান দরকার। প্রয়োজনে প্রতি সপ্তাহে ওষুধ ছেটাতে হবে।

গুটিপচা রোগ : এই রোগে গুটি ও পরে বীজ পচতে শুরু করে। ফলন প্রায় ৬০ ভাগ কমে যায়।

প্রতিকার : মরচে রোগের অনুরূপ।

ব্যাকটিরিয়াল পাতাপচা রোগ : পাতায় প্রথমে ছোট ছোট গোল জলে ভেজা দাগের মতন দেখায় ও পরে বাঁকা বাঁকা ধূসর রং নেয়। এই রোগ বীজ থেকে আসে।

প্রতিকার : শোধন করা বীজ ব্যবহার করাই একমাত্র প্রতিকারের উপায়।

রেড়িতে পাঁচ প্রকারের পোকার আক্রমণ হয় :

১। **রেড়ির শুঁয়ো পোকা :** এরা বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসে বেশী দেখা দেয়। এরা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে নেয়। ফলে পাতা শুকিয়ে পড়ে যায়।

প্রতিকারের উপায় : শতকরা ১০% বি. এইচ. সি. গুঁড়ো হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি হারে ছিটিয়ে দিতে হবে। অথবা ১০০০ লিটার জলে ১.৫ লিটার থায়োডেন-৩৫, গুলে ছেটাতে হবে।

২। **রেড়ির তিড়িঙ্গে পোকা :** এই পোকার শুককীট পাতার নীচের দিকের অংশ খেয়ে গাছ সম্পূর্ণ নেড়া করে ফেলে। পোকার গায়ে লাল ও সাদা ডোরাকাটা দাগ থাকে।

প্রতিকার : শুঁয়োপোকা দমনের অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। **কাণ্ড ছেঁদাকারী পোকা :** ফুল আসা ও গুটি ধরার সময় এই পোকার আক্রমণ হয়। এই পোকার শুককীট পাতা থেকে

শুরু করে বীজ পর্যন্ত আক্রমণ করে শেষ করে দেয়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এই পোকার উপদ্রব বেশী দেখা দেয়।

প্রতিকার: নুভান ১০০-৩৭৫ মিলি অথবা মেটাসিড্ ৫০-১২৫০ মিলি ৩৭৫ লিটার জলে গুলে ছেটাতে হবে।

৪। **জেসিড্:** এই শ্যামা পোকা রেড়ির সবথেকে বেশী ক্ষতি করে। গাছের পাতার রস খেয়ে গাছকে মেরে ফেলে।

প্রতিকার: ০'০৫% থায়োডেন-৩৫ ব্যবহার করা চাই।

৫। **লাল আকড়:** এই আকড় পাতার রস শুষে নেয়। ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। রোগর-৩০ অথবা মেটাসিসটক্স্-২৫ (৬২৫ মিলিলিটার)-ও ৩৭৫ লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

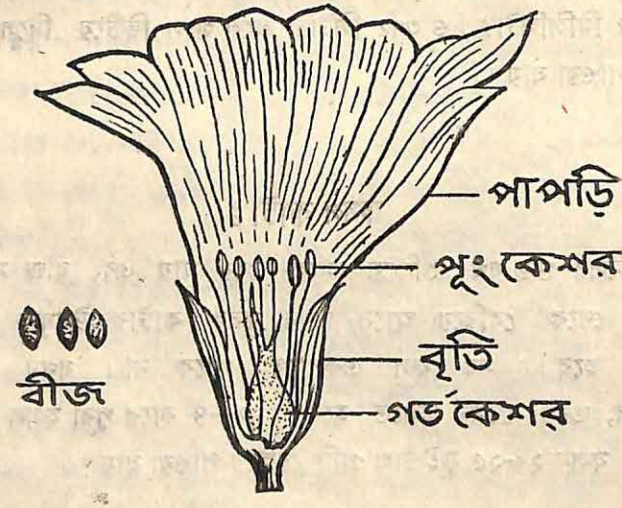
ফসল কাটা:

ফলের গুচ্ছ যখন শুকিয়ে কালো হয়ে যায় এবং বীজ সহজেই খোসা থেকে বেরিয়ে আসে তখন ফসল কাটার উপযুক্ত হয়েছে বুঝতে হবে। সব ফল একসাথে পাকে না। যখন যেমন পাকবে, তখন তেমন তুলতে হবে। ৩—৪ বারে পুরা ফসল তোলা হয়। ফলন ২০-২৫ কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে পাওয়া যায়।

তিসি

তিসি এমন একটি ফসল যার থেকে দুটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা পাই। যেমন তেল ও লিনেন সুতো।

তিসির বীজ থেকে সুস্বাদু তেল প্রায় ৩৭% পাওয়া যায়। এই তেল আচার, রঙ, বারনিস্, কালি, সাবান, অয়েলক্লথ, বর্ষাতি ইত্যাদি তৈরী করতে লাগে। গাছের আঁশ থেকে লিনেন সুতো তৈরী হয়। টয়েন সুতো ও কম্বল এই সুতো থেকে তৈরী হয়। তিসির খইল



তিসি ফুল

গো-খাদ্য হিসাবে খুব ভাল। এতে ৩৬% প্রোটিন পাওয়া যায় তাছাড়া জমিতে সার হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। এতে ৫% নাইট্রোজেন, ১·৪% ফসফেট ও ১·৮% পটাশ সার পাওয়া যায়।

উৎপত্তি ঃ

তিসি প্রায় ৫০০০ বছর আগেও জন্মাত বলে জান যায়। এই ফসল দু রকমের ঃ

১। দানা ও বড় দানা তিসি। ছোটদানা তিসির উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ। বড় দানা তিসির উৎপত্তি স্থান ইটালি, গ্রীস প্রভৃতি দেশ।

২। বড় দানার তিসি থেকে কেবল আঁশ তৈরী হয়।

তিসির বীজ তিন ধরনের রঙের পাওয়া যায়ঃ

হলুদ বা সাদা, বাদামী, ফন।

ফুলের পাপড়ির রঙও তিন প্রকারঃ—সাদা, হালকা নীল ও মেটে রঙ। তিসি গাছ ৩০-১২০ সেমি উঁচু হয়। তেল হয় এমন গাছ বেঁটে বা ছোট হয়। আঁশের জন্য লম্বা জাতের গাছ লাগান হয় শিকড় মাটির বেশী গভীরে যায় না। কাণ্ড সরু হয় এবং গাছের গোড়া থেকেই শাখা বের হয়, পাতা সরু ও লম্বা হয় ফুল অসংখ্য হয়। গুটি দেখতে গোলাকার হয়। গুটির মধ্যে ৫টি ঘর থাকে এবং তার মধ্যে চ্যাপটা উজ্জ্বল বাদামী বা সাদা বা হলদে বীজ পাওয়া যায়।

গাছের বিবরণঃ

আবহাওয়াঃ তিসি শীতকালীন ফসল।

মাটিঃ তিসি যে কোন প্রকারের মাটিতে জন্মায়। তবে এই ফসল এঁটেল বা পলি মাটি পছন্দ করে। পশ্চিমবঙ্গে পলিমাটি অঞ্চলেই কেবল এর চাষ হয়।

জাতঃ পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী জাতঃ—

১। **টি-৩৯৭**—এই জাত ১২৫-১৪৫ দিনে পাকে। ফুলের রং নীল, বীজের রঙ বাদামী ও ৪৩% তেল পাওয়া যায়। এই জাতটি মরচে ও ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

২। **মুক্তা**—জলদি জাত পাকতে ১২৫-১৩০ দিন সময় নেয়। এই জাতের ফুল সাদা ও সামান্য নীলাভ। ৪৫% তেল পাওয়া যায়।

৩। **বি-৬৭**—জলদি জাতের তিসি। ১২০-১৩০ দিনে পাকে। বীজের রঙ বাদামী। মরচে ও ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

ফসল পরিক্রমা ঃ সাধারণতঃ খরিফ ফসল যেমন ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, বাদাম, বরবটী ও সোয়াবীনের পরে এর চাষ হয়। তাছাড়া মিশ্র ফসল হিসাবে যব, গম, ছোলা ও সরষের সাথে লাগান হয়।

জমি তৈরী ঃ জমি ভাল ভাবে ঝুরঝুরে করে চাষ দিতে হবে। বোনার সময় জমিতে বেশ রস থাকা দরকার। সম্ভব হলে জৈব সার বা আবর্জনা সার দিলে ফলন ভাল হয়।

বোনার সময় ঃ পুরো কার্তিক মাস ধরে তিসি বোনা যায়। শোধনকরা বীজ অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। অ্যানকোজেব বা ব্রাসিকল ওষুধ বীজ শোধনের পক্ষে ভাল।

সার প্রয়োগ ঃ বিনা সেচে চাষ করলে জমিতে শেষ চাষ দেবার আগে হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১২˙৫ কেজি ফস্‌ফেট ও ১২˙৫ কেজি পটাশ সার দিতে হবে। সেচ-সেবিত এলাকায় উপরোক্ত সার ২৫ ঃ ২৫˙২৫ হবে। পরে-প্রথম সেচের সময় আরও ২৫ কেজি নাইট্রোজেন সার চাপান হিসাবে দিতে হবে।

বীজ বোনা ঃ সারিতে বুনলে ৩০ সেমি দূরে দূরে সারি টেনে বীজ বুনতে হবে। প্রতি সারিতে ৫ সেমি দূরে দূরে বীজ বোনা চাই।

সেচ ঃ সাধারণতঃ তিসি অসেচ এলাকার উপযুক্ত ফসল। তবে সেচ দিলে ফলন বাড়ে। সেচ-সেবিত এলাকায় বোনার ৩০ দিন পরে প্রথম ও ফুল আসার সময় দ্বিতীয় বার সেচ দিতে হবে।

নিড়ানী ঃ তিসি গাছ ছোট ও পাতা খুব মরা হয়। সেজন্য জমিতে আগাছা বেশী জন্মায়। এই কারণে এই ফসলে বেশ নিড়েন দেওয়া আবশ্যক। বোনার ২১ ও ৪২ দিন পরে নিড়েন দেওয়া এবং দরকার বুঝে গাছ পাতলা করে দেওয়া দরকার।

রোগ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার ঃ

মরচে রোগ ঃ এই রোগে ফিকে গোলাপী রঙের দাগ কাণ্ড, ডাল, পাতা ও গুটিতে দেখা দেয়। গাছ ধীরে ধীরে ফিকে হলুদ ও পরে মরে যায়।

প্রতিকার: ১। রোগ সহনশীল জাতের গাছ লাগান চাই। ২। সালফার গুঁড়ো হেক্টর প্রতি ২০ কেজি করে ছড়াতে হবে। অথবা ডাইথেন জেড ২ কেজি ২০০০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ: এক ধরনের ছত্রাক থেকে হয়। এই রোগ গাছের সব অবস্থায় হয়। পাতা হলদে হয়ে পরে শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার: উন্নত সহনশীল প্রজাতির মুগা বীজ ব্যবহার করতে হবে।

পাউডারী মিলডিও: এই রোগ এক ধরনের ছত্রাক থেকে হয়। সাদা সাদা গুঁড়োর মতন পদার্থ পাতার ডগায় দেখা দেয়। পরে গাছের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বীজের দানা ছোট হয়।

প্রতিকার: সালফার গুঁড়ো প্রয়োগ করলে ভাল ফল হয়।

পাতার দাগ: এই রোগ এক ধরনের ছত্রাক থেকে হয়। এই রোগ মূলতঃ ফুল ও কুঁড়িতে দেখা দেয়। ফলে ফুল নষ্ট হয়ে ঝরে যায়।

প্রতিকার: ১। শোধন করা বীজ ব্যবহার করা দরকার। ২। রোগ সহনশীল প্রজাতির ব্যবহার। ৩। জিনের জাতীয় ওষুধ স্প্রে করা। প্রয়োজনে ১০-১৫ দিন পরে আর একবার দেওয়া।

পোকার আক্রমণ:

তিসি মাছি: কমলালেবু রঙের মাছি এই গাছের কুঁড়ি নষ্ট করে। এরা কুঁড়ির মধ্যে ডিম পাড়ে। পরে শুককীট কুঁড়ি খেয়ে শেষ করে দেয়।

প্রতিকার: রোগর বা বি এটা সি ১০% গাছে প্রয়োগ করা দরকার।

শুককীট: এরা পাতা খেয়ে শেষ করে দেয়। থায়োডেন জাতীয় ওষুধ স্প্রে করে পোকার আক্রমণ কমান যায়।

কাটা ও শুকান: গাছ হলুদ হলে কাটা উচিত। কাটার পর ৪-৫ দিন ফেলে রাখা, গরু দিয়ে পরে মাড়াই করে বীজ বের করা হয়।

ফলন: হেক্টরে প্রায় ২০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়।

কুসুম (ক্যারথামাস টিংচোরিয়াস)

কুসুমের চাষ ভোজ্য তেলের জন্য করা হয়। তাছাড়া ফুল থেকে রং তৈরী হয়। কুসুম বীজে ২৪—৩৬ ভাগ তেল থাকে। কুসুম তেল প্রায় সূর্যমুখীর তেলের মতন গুণ আছে কারণ এই তেলে ৭৮% লাইনোলিক এ্যাসিড্ থাকে যা হার্টের রুগীদের পক্ষে ভাল। এই



কুসুম ফুল

এ্যাসিড শরীরের কোলেসটেরল কমায়, কুসুম খইল গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এতে ৪৫% প্রোটিন থাকে। আবার খইল সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এতে ৫% নাইট্রোজেন, ১'৪৪% ফসফরাস

ও ১'২৩ ভাগ পটাশ খাদ্য থাকে, অনেকে কুসুমবীজ ভেজে মুড়ির সঙ্গে মিশিয়ে খায়।

আদিনিবাস ও ভারতে আগমন ঃ

উৎপত্তি ঃ ভারতে পুরাকাল থেকে কুসুম চাষ হয়। অনেকের মতে আরবদেশ হল এদের আদিনিবাস। কেউ কেউ বলেন কুসুম-এর আদিনিবাস হল ভারত ও আফগানিস্থান।

চাষ এলাকা ঃ ভারত, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও স্পেন দেশে কুসুম চাষ বেশী হয়, বিশ্বের মোট আবাদী এলাকার ৫০% কুসুমের চাষ ভারতে হয় এবং উৎপাদানও ভারত শীর্ষ স্থানে আছে। ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে কুসুমের চাষ বেশী হয়।

গাছের বিবরণ ঃ

কুসুম গাছ বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এর উচ্চতা প্রায় ১২০ সেমি। এদের ১০—১২ শাখা হয়। এদের পাতায় কোনো বোঁটা হয় না। পাতার ধার কাটা কাটা থাকে এবং পাতায় কাঁটা থাকে। ফুলের বৃতির ধারে কাঁটা থাকে। ফুলের রঙ হলুদ বা লেবু রঙের হয়। একসাথে ২০-৫০ টা ফুল থাকে, ফলের রং উজ্জ্বল সাদা হয়।

আবহাওয়া ঃ কুসুম শীতকালীন ফসল। কুসুমের চারা ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। কিন্তু ফুল ফোটার সময় বেশী তাপ সহ্য করে না। কুসুম জল চাপ সহ্য করতে পারে না।

মাটি ঃ খরা সহনশীল বলে এই ফসল যে-কোন প্রকারের মাটিতে হতে পারে। লবণাক্ত মাটিতে কুসুম চাষ হয়; কিন্তু এই মাটিতে চাষ করলে তেলের ভাগ কমে যায়। সুন্দরবনের নোনা মাটি বা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার লাল মাটিতে কুসুম চাষ সম্ভব, ভাল করে মাটি ঝুর ঝুর করে নিয়ে কুসুম বীজ বোনা দরকার।

বোনার সময়ঃ পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে পুরো কার্তিক মাসেই কুসুম বোনার উপযুক্ত সময় সুন্দরবন এলাকায় আমন ধান কেটে নেবার পর অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও কুসুমের চাষ করা চলে।

জাতঃ পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী জাত হল **সি. টি. এস-৭৪০৩, সি. টি. এস-১৬৮ ও এ. পি. আর. আর-১।** এই তিনটি জাত ১২০-১৩০ দিনের মধ্যে পাকে।

বোনাঃ ব্রাসিকল-৫৭, মেনকোজে দিয়ে শোধন করা বীজ বোনা উচিত। ১৫ কেজি বীজ প্রতি হেক্টর জমির জন্য লাগবে। প্রতি বর্গমিটার জমির জন্য ১০০টি গাছ লাগালে সবথেকে বেশী ফলন পাওয়া যায়। প্রতি সারির দূরত্ব ৪৫ সেমি হওয়া চাই। ১০ সেমি দূরে দূরে প্রতি সারিতে বীজ বুনতে হবে, বীজ অন্ততঃ ৫ সেমি মাটির গভীরে পড়বে। সুন্দরবন অঞ্চলে সারিতে খুপী করে বুনতে হবে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছিটিয়ে বোনা যায় তবে প্রতি বর্গমিটার জমিতে একশ'র বেশী চারা থাকা উচিত নয়।

সার প্রয়োগঃ বেলে দো-আঁশ মাটিতে জৈবসার অত্যন্ত প্রয়োজন। এইজন্য ১৫০—২০০ কুইন্টাল কম্পোস্ট সার জমিতে দিতে হবে। কুসুম নাইট্রোজেন সার পছন্দ করে। তাছাড়াও বীজ উৎপাদন ও বীজের উৎকর্ষ বাড়ায়। সেচবিহীন এলাকায় জমি তৈরীর সময় শেষ চাষ দেবার আগে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি নাইট্রোজেন ২০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ সার দিতে হবে। সেচ এলাকায় ৪০ কেজি নাইট্রোজেন শেষ চাষে ও ৪০ কেজি ২০ দিন পরে আগাছা নিড়িয়ে সেচ দেবার পরে চাপান দিতে হবে।

পরিচর্যাঃ জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রয়োজনে বোনার ২০ দিন ও ৪০ দিন পরে একবার করে নিড়ান দিতে হবে।

সেচঃ কুসুম চাষে সেচ লাগে না, তবে সেচ দিলে ফলন বাড়ে। সেচ-সেবিত জমিতে ২টি হালকা সেচ ২০-৪০ দিন পরে দিলে ভাল হয়।

শস্যরক্ষা ও প্রতিকার ঃ

মরচে পড়া রোগ ঃ এই রোগে পাতার উভয় দিকে হলুদ দাগ দেখা দেয়।

প্রতিকার ঃ রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার ও শোধন করা বীজ ব্যবহার।

ধসা রোগ ঃ ধসা রোগে গাছের গোড়ায় পচন ধরে ও বড় গাছে ফুল ডাঁটা ঝরে পড়ে।

প্রতিকার ঃ ফসল পরিক্রমা (২—৩ বছর পরে পরে) ও সহনশীল জাত ব্যবহার করা।

ডাইথেন. এম-৪৫ প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০০০ লিটার মিশ্রণ ছড়াতে হবে।

পোকার আক্রমণ ঃ

কুসুম মাছি ঃ এই মাছির শরীর হালকা ছাই রঙের। বাদামী রঙের এদের বাচ্চারা ফুল খেয়ে ফেলে। ফলে ফুল পচে যায় পরে কুঁড়ি ও ফুলের মধ্যে পুওলি তৈরী করে। ফুলের ভেতর থেকে রস বের হয় এবং তা থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ে।

প্রতিকার ঃ ১। আক্রান্ত ফুল বা কুঁড়ি তুলে ফেলা ২। ০.০৩% ডিমেথেওয়েট বা ০.১% ফেনিথিয়ন স্প্রে করলে ফসল রক্ষা করা সম্ভব।

জাব পোকা ঃ এই পোকার রং কালো ও অত্যন্ত নরম হয়। এরা পাতা, ডালপালা, ফুল ও গুটি আক্রমণ করে।

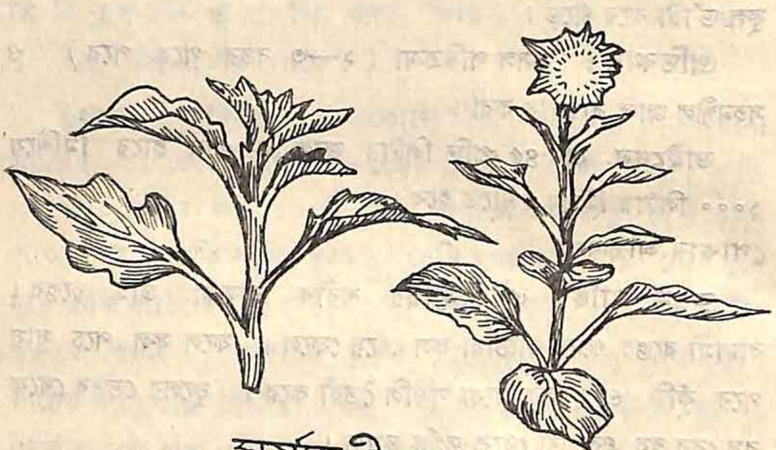
প্রতিকার ঃ মেটাসিসটকস্ বা ডিমেক্রন অথবা রোগর আক্রান্ত গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

কাটাই ও ঝাড়াই ঃ কুসুম পাকতে প্রায় ১২০-১৩০ দিন লাগে, পুরো গাছ যখন হলুদ হয়ে যায় তখন কাটার উপযুক্ত হয়। সকালে ফসল কাটা উচিত বেলায় কাটলে কাঁটা গায়ে লাগে। কাটা ফসল ৪ দিন ফেলে রাখার পর শক্ত লাঠি জাতীয় জিনিস দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে হয়।

ফলন ঃ সেচ-সেবিত এলাকায় ১৫-২০ কুইন্টাল ও অসেচ এলাকায় ৮-৯ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়।

সূর্যমুখী (হেলিএনথাস এনাস্)

সূর্যমুখী ভারতে অনেক প্রাচীন কাল থেকে পরিচিত। এই গাছ বাগানে লাগান হয়, সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য কিন্তু আজকাল ভারতে ভোজ্যতেলের জন্য এর চাষ হয় এ থেকে ৪৫% ভাল তেল পাওয়া যায়। সূর্যমুখীর চাষ ভবিষ্যতে আরও জনপ্রিয় হবে কারণঃ ১।



সূর্য্যমুখী গাছ

অল্পদিনের ফসল ২। অধিক তেল পাওয়া যায় ৩। সারা বৎসর এর চাষ সম্ভব। সূর্যমুখী আলোক সংবেদনশীল নয় এবং খরা সহনশীল।

সূর্যমুখী তেলের রং হালকা হলুদ এবং সুন্দর গন্ধযুক্ত। এই তেল বনস্পতি ঘি বানাতেও লাগে যেহেতু এতে প্রায় ৬৪ % লিনোলিক এ্যাসিড্ আছে সেই কারণে হার্টের রুগীদের পক্ষে সূর্যমুখীর তেল ব্যবহার করা ভাল।

সূর্যমুখীর তেল প্রসাধন সামগ্রী তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। খইল গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আদিনিবাস ও ভারতে আগমনঃ

সূর্যমুখীর আদিনিবাস যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো। উনবিংশ শতাব্দিতে রাশিয়াতে প্রথমে তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য চাষ

করা হয়। তারপর থেকে বিশ্বের বহু দেশে সূর্যমুখীর চাষ শুরু হয়। ভারতে ১৯৬৯ সালে প্রথম সূর্যমুখীর চাষ আরম্ভ হয়।

এলাকা ঃ সোভিয়েত দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, আরজেনটিনা, রুমানিয়া, স্পেন, যুগোস্লাভিয়া, তুরস্ক ও দক্ষিণ এমেরিকাতে সূর্যমুখীর চাষ বেশী



হয়। ভারতে এখনও ব্যাপকতা লাভ করেনি। দু শ্রেণীর সূর্যমুখীর গাছ আছে।

১। লম্বা গাছ ও একটা বড় ফুল।

২। ছোট গাছ ও অসংখ্য ছোট ফুল।

গাছের বিবরণ ঃ

আবহাওয়া ঃ সূর্যমুখী চারা অবস্থায় ঠাণ্ডা আবহাওয়া পছন্দ করে। গাছের ৬টি পাতা হওয়া পর্যন্ত কুয়াশাতে কোন ক্ষতি হয় না। তারপর থেকে ফুল আসা পর্যন্ত উষ্ণ আবহাওয়া পছন্দ করে। এবং ফুল ফোটা থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত গরম আর প্রচুর সূর্যালোকের প্রয়োজন। মেঘলা আকাশ ও আর্দ্রতা বীজ তৈরীর সহায়ক নয়। সূর্যমুখী শীত শরৎ ও বর্ষাকাল সবসময়ে হয়। খরিফ খন্দে ৮০-৯০ দিন, শীতকালে ১৩০ দিন ও শরৎকালে ফসল তুলতে ১০০—১১০ দিন সময় লাগে।

মাটি ঃ সূর্যমুখী সবরকম মাটিতে হয় তবে হালকা ও মাঝারি জমিতে ভাল হয়। সেচ-সেবিত ও জল-নিকাশীযুক্ত জমিতে এর চাষ প্রয়োজন।

জাত ঃ

ই. সি. ৬৮৪১৪ ঃ গাছ লম্বা, প্রায় ১২০—২৪০ সেমি। একটি মাত্র প্রান্তিক ফুল। ফুলের ব্যাস ১৫—২৫ সেমি। পাকতে সময় নেয় ৯৫—১২৫ দিন। সেচ দিলে হেক্টরে ফলন ১২–১৫ কুইণ্টাল, বিনা সেচে ৬—৮ কুইণ্টাল। তেলের ভাগ শতকরা ৪০—৪৪।

মরডেন ঃ গাছ বেঁটে, ৯০—১২০ সেমি। একটি মাত্র প্রান্তিক ফুল। ফুলের ব্যাস ১০—২০ সেমি। পাকতে সময় নেয় ৮০—৯০ দিন। ঝড়ে কোন ক্ষতি করে না। সেচ-সেবিত অঞ্চলে ফলন ১০—১২ কুইণ্টাল এবং অসেচ এলাকায় ৬—৮ কুইণ্টাল। তেলের ভাগ ৪০—৪৩%।

ফসল পরিক্রমা ঃ সূর্যমুখী বিভিন্ন ফসলের সাথে চাষ করা যায় ঃ

১. ভুট্টা—সূর্যমুখী
২. ধান—সূর্যমুখী
৩. ভুট্টা—আলু, সূর্যমুখী
৪. অড়হর—সূর্যমুখী
৫. সূর্যমুখী—কুসুম
৬. ভুট্টা—সরাখ (টোরী)—সূর্যমুখী

জমি তৈরী : সূর্যমুখীর জন্য প্রয়োজনীয় রসযুক্ত আগাছামুক্ত ঝুরঝুরে মাটি প্রয়োজন। এর জন্য ৩—৪ বার দেশী লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। জমি মই দিয়ে সমতল করতে হবে। সূর্যমুখীর বীজ শক্ত ও খোসা মোটা। সেজন্য বীজ বোনার সময় পর্যাপ্ত রস জমিতে থাকা দরকার।

সার প্রয়োগ : বিনা সেচে চাষ করলে জমি তৈরী করার সময়, শেষ চাষের আগে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন ২০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাস সার দিতে হবে। সেচ-সেবিত অঞ্চলে শেষ চাষে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট ও ৪০ কেজি পটাস সার দিতে হবে। প্রথম সেচের সময় আরও ৩০ কেজি নাইট্রোজেন সার চাপান হিসাবে দিতে হবে।

বীজের হার : এক হেক্টরের জন্য ব্রাসিকল-৭৫ দিয়ে শোধন করা ১৫ কেজি বীজ লাগবে।

বোনার সময় : সূর্যমুখী বছরের যে কোন সময় বোনা যায়। তবে অধিক বৃষ্টিপাত এলাকায় বর্ষাকালে না বোনাই ভাল। শীতকালে বোনা ফসল অধিক ফলন দেয়।

বীজ বোনা : সারিতে ছাড়া সূর্যমুখী বোনা উচিত নয়। বেঁটে জাতের জন্য সারির দূরত্ব ৪৫ সেমি আর লম্বা জাতের জন্য ৬০ সেমি হওয়া চাই। সারিতে ৩০ সেমি দূরে দূরে বীজ বুনতে হবে। ৩০ দিন পরে আগাছা নির্মূল করতে হবে আর অপ্রয়োজনীয় গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে।

সেচ : সূর্যমুখীর জন্য সেচ লাগে না। তবে শীত ও গরমকালে বোনার আগে সেচ প্রয়োজন। তাছাড়া ৪০, ৭৫ ও ১১০ দিনের মাথায় সেচ দেওয়া দরকার। গরম কালে লাগান ফসলের জন্য ১৫ দিন অন্তর সেচ দেবার প্রয়োজন হতে পারে।

পরিচর্যা : বোনার ৬০ দিন পর্যন্ত আগাছা জমিতে একদম থাকবে না। তার জন্য প্রয়োজন হলে বারে বারে আগাছা নির্মূল করতে হবে। গাছের উচ্চতা যখন প্রায় ৭৫ সেমি হবে, তখন গাছের

গোড়ায় মাটি ধরাতে হবে। এই অবস্থায় গোড়ায় মাটি না দিলে ফলন্ত গাছ পড়ে যেতে পারে।

রোগ পোকার আক্রমণ ও তার প্রতিকার ঃ

সূর্যমুখী কয়েক রকমের রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় ঃ

১। **বীজের পচন ঃ** বীজ লাগাবার পরে অনেক বীজ পচে যায় কারণ বীজের খোসায় সাদা সাদা দাগ থাকে। ক্যাপটান বা ডাইথেন এম.-৪৫ দিয়ে শোধন করা বীজ বোনা দরকার।

২। **কালো পচন রোগ ঃ** সাধারণতঃ গরমকালে এই রোগ বেশী হয়, আক্রান্ত গাছ তাড়াতাড়ি পাকে ও কাণ্ড কালো হয়ে যায়। ফুল ছোট হয়, বীজ কম ধরে।

প্রতিকার ঃ ১। ভাল বীজ ব্যবহার করা।
২। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলা।
৩। ৩—৪ বছরে ফসল পরিক্রমা গ্রহণ করা।

ধসা রোগ ঃ বর্ষাকালে এই রোগ বেশী হয়। পাতায় প্রথম ঘন বাদামী রঙের গোল দাগ দেখা যায় পরে রোগ বাড়লে গোল গোল দাগে পাতা ছেয়ে যায়। অনেকগুলি দাগ মিলে পাতাকে শুকিয়ে দেয়। শুকনো পাতা পড়ে যায়।

প্রতিকার ঃ ১। শোধন করা বীজ ব্যবহার।
২। অনুমোদিত উন্নত বীজ ব্যবহার।
৩। ডাইথেন এম-৪৫ ৩ কেজি (প্রতি হেক্টরে) ১০০০ লিটার জলে গুলে পাতার নীচে দিতে হবে।

পোকার আক্রমণ ঃ

কাটুই পোকা ঃ চারাগাছকে গোড়া থেকে কেটে দেয়। আলু বা সবজীর জমিতে সূর্যমুখী লাগালে কাটুই পোকার আক্রমণ বেশী হয়।

তিড়িঙ্গে পোকা, শুঁয়ো পোকা বা শূককীট, শোষক পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

প্রতিকার ঃ কাটুই পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজি অলড্রিন বা হেপটাক্লোর শেষ চাষের সময় জমিতে দিতে হবে।

অন্যান্য পোকার জন্য থায়োডেন বা একালাক্স রোগর বা ডিমেক্রন অনুমোদিত মাত্রায় ছেটাতে হবে।

ফসল কাটা ঃ ফসল পেকেছে কিনা জানতে হলে দেখতে হবে বীজ কালো হয়েছে কিনা আর ফুলের পেছন দিক নরম হয়েছে কিনা। ফুল কেটে আলাদা আলাদা শুকিয়ে নিতে হবে। ফুল ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে শতকরা ১০ ভাগের বেশী জল না থাকে।

ফলন ঃ যত্ন নিয়ে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ২০ কুইন্টাল অব্দি ফলন পাওয়া যায়।

সরষে (ব্রাসিকা জাত)

সরষে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ জাতীয় ফসল। বাদাম তেলের পরেই সরষে তেলের স্থান। দক্ষিণ ভারতে যেমন বাদাম তেল যাবতীয় রান্নায় ব্যবহৃত হয় সেই রকম উত্তর ভারতে সরষের তেল রান্নায় ব্যবহার করা হয়। সরষে উৎপাদনে ভারত বিশ্বের শীর্ষে এবং প্রায় ১৬·২ লক্ষ টন সরষে এদেশে উৎপন্ন হয়। এদেশে তিন প্রকার সরষের চাষ হয় এবং বীজ থেকে ৩৭—৪৯ শতাংশ তেল পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে সাদা সরষে, রাই সরষে আর টোরি সরষে এই তিন প্রকার সরষের চাষ হয়। সরষে বীজ ও তেল রান্না ছাড়াও আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরী করতে লাগে, তাছাড়া ওষুধ, মাথার তেল এবং যন্ত্র-পাতি তৈলাক্ত করতে সরষের তেলের প্রয়োজন। সরষের খইল গো-খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সরষে পাতা কচি অবস্থায় শাক হিসাবে রান্না করে খাওয়া হয়, সরষে বীজ বেটে কাসুন্দী করা হয়।

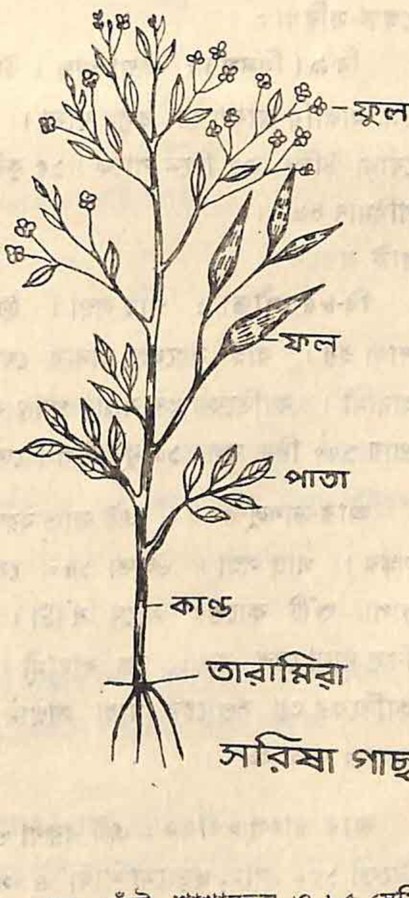
আদিনিবাস ও ভারতে আগমন ঃ

উৎপত্তি ঃ চীনদেশ থেকে সরষে ভারতে প্রথম আসে। ভারত থেকে পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে দিয়ে আফগানিস্থানে যায়, গবেষকরা সাদা সরষেকে সবথেকে পুরান জাত বলে বর্ণনা করেন।

এলাকা ও বিস্তার ঃ বিশ্বের সরষে উৎপাদনকারী দেশ হল ভারত, চীন, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, সুইডেন পোল্যাণ্ড ও কানাডা। সরষে চাষের এলাকার দিক থেকে ভারত বিশ্বের শীর্ষে ও উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে আছে। বিশ্বের মোট সরষে উৎপাদনের ১৬% অংশ ভারতে হয়। ভারতের উত্তর অঞ্চলে সবথেকে বেশী চাষ হয় ও উৎপাদনের ৬০% কেবল উত্তরপ্রদেশে হয়।

গাছের বিবরণ ঃ

আবহাওয়া ঃ সরষে নাতিশীতোষ্ণ এবং শীতপ্রধান অঞ্চলেও হয়। সরষে শীত ও শুকনো আবহাওয়া পছন্দ করে। যদিও সরষে শীতকালীন ফসল কিন্তু মাটিতে প্রয়োজনীয় জল, ঠাণ্ডা পরিবেশ, উজ্জ্বল সূর্যালোক ও পরিষ্কার আকাশ না হলে তেলের ভাগ কমে যায়। সরষে অল্পদিনের ফসল। মোটামুটি পরিষ্কার ৮ ঘণ্টা দিনের আলো পেলে ফলন ভাল হয়।



সরিষা গাছ

মাটি ঃ সব প্রকার সরষের জন্য মাঝারি মাটি খুব ভাল। টোরী হালকা মাটি (দো-আঁশ) পছন্দ করে। তারামিরা বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয় এবং জল চাপ সহ্য করতে পারে না এবং সামান্য লবণাক্ত জমিতেও এই সরষের চাষ করা চলে।

জাত ঃ পশ্চিমবঙ্গের উপযুক্ত জাত হল ঃ

টোরী বি-৫৪ (অগ্রণী) ঃ গাছ বেঁটে, শাখাবহুল ও ৮৫ সেমি পর্যন্ত উঁচু হয়। বীজ ছোট লালচে বাদামী ও খোসা চক্‌চকে এবং মসৃণ। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত

বোনা চলে। পাকতে ৭০-৭৫ দিন সময় নেয়। তেলের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ ফলন ১৪ কুইণ্টাল পর্যন্ত দেবার ক্ষমতা আছে।

কম্পোজিট-২ : বি-৫৪ থেকে সামান্য লম্বা। বীজ মাঝারি আকারের। কার্তিকের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বোনা উচিত। ৭৫-৮০ দিনে পাকে। ১৪ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেবার ক্ষমতা থাকে তেলের পরিমাণ 'শতকরা ৪২ ভাগ।

শ্বেত-সরিষা :

বি-৯ (বিনয়) : লম্বা গাছ। উচ্চতা প্রায় ১০০ সেমি ডালপালা কম, মাঝারি আকারের হলুদ দানা। কার্তিকের প্রথম পক্ষে অবশ্যই বোনা উচিত, ৯৫ দিনে পাকে। ১৫ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন হয়। তেলের পরিমাণ ৪৬%।

রাই সরষে :

বি-৮৫ (সীতা) : গাছ লম্বা। উচ্চতা ১২০ সেমি, গাছে প্রচুর শাখা হয়। রাই সরষের দানার খোসা কোঁচকান। বীজের রঙ বাদামী। কার্তিকের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত লাগান যায় পাকতে সময় নেয় প্রায় ১০০ দিন, ফলন ১৫ কুইণ্টাল। তেলের ভাগ ৩৮%।

আর-ডাবলু-৩৫১ : এই জাত বরুণা ও এপ্রেস্ট মিউটেণ্ট জাতের সঙ্কর। গাছ লম্বা। উচ্চতা ১৫০ সেমি শাখা-প্রশাখা বেশী কিন্তু চাপা, শুঁটি কাণ্ডের সাথে সাঁটা। দানার খোসা কোঁচকানো; কিন্তু দানা বেশ বড়। রঙ বাদামী। পাকতে ১১০ দিন লাগে। কার্তিকের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে লাগান উচিত, ফলন ১৭ কুইণ্টাল। তেলের ভাগ ৩৮%।

আর ডাবলু-৮৫/৫৯ : এটি বরুণা ও বি-৮৫ এর সঙ্কর, গাছ লম্বা। উচ্চতা ১৫০ সেমি, ছড়ানো শাখা ও সংখ্যায় অনেক, দানার খোসা, কোঁচকানো ও রঙ বাদামী, দানা বড়। কার্তিকের মধ্যেই লাগান উচিত। ১১৫ দিনে পাকে, তেলের ভাগ ৩৮% এবং ফলন প্রায় ১৮ কুইণ্টাল

তারামিরা :

টি-২৭ : গাছ বেঁটে, উচ্চতা ১১০-১২০ সেমি, দানা মাঝারি। ১৫০ দিনে পাকে। কার্তিকের ২য় সপ্তাহের মধ্যে বোনা উচিত। ফলন ৮ কুইন্টাল, তেলের ভাগ ৩৫%।

ফসল পরিক্রমা ও মিশ্র ফসলের চাষ :

১ম	২য়	৩য়
ভুট্টা	টোরী	গম
,,	,,	আখ
বাজরা	,,	যব
ভুট্টা	,,	তুলো
মুগ	রাই/সাদা সরষে	পাট/আউশ
কলাই	,,	,,
ভুট্টা	,,	গম
পাট/আউশ	,,	,,

জমি তৈরী : জমি এমন করে তৈরী করতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকে। একেবারে আগাছা, আগের ফসলের কাণ্ড বা শিকড় যেন না থাকে ; মাটি একবারে ঝুর ঝুরে হবে ঢেলা একদম থাকবে না।

বোনার সময় :

টোরী : আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ।

শ্বেত সরিষা : কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই বুনতে হবে।

রাই : কার্তিকের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে বুনতে হবে।

তারামিরা : আশ্বিনের ২য় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের ২য় সপ্তাহের মধ্যে বুনতে হবে।

বীজের হার : সব রকমের সরষের জন্য হেক্টর প্রতি বীজ শোধন করা ৫-৬ কেজি লাগবে।

বীজ বপন : ৩০ সেমি দূরে দূরে লাইনে বুনতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে, বোনার পরে মই দিতে হবে।

সার প্রয়োগ : জমি তৈরীর সময় সম্ভব হলে হেক্টর প্রতি ২০০ কুইন্টাল জৈব সার দেওয়া ভাল। জৈব সার দিলে তেলের মান ভাল হয়। রাসায়নিক সার এইভাবে দিতে হবে।

টোরি ও তারামিরার জন্য : বিনা সেচে লাগালে জমি তৈরীর সময় শেষ চাষের আগে হেক্টর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন. ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ সার দিতে হবে। সেচ-সেবিত জমিতে প্রথম সেচের সময় আরও ২০ কেজি নাইট্রোজেন সার চাপান দিতে হবে।

শ্বেত ও রাই সরষে : অসেচ জমিতে জমি তৈরীর সময় শেষ চাষের আগে ৪০ কেজি নাইট্রোজেন ২০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ সার দিতে হবে। সেচ-সেবিত জমিতে প্রথম সেচের সময় আরও ৪০ কেজি নাইট্রোজেন সার চাপান হিসাবে দিতে হবে।

সেচ : সুবিধা থাকলে টোরি ও তারামিরার জন্য বোনার ২০-২২ দিন পরে এবং শ্বেত ও রাই সরষের জন্য বোনার ৩০ দিন পরে প্রথম সেচ দিতে হবে। প্রথম সেচ দেবার পরে সুবিধা থাকলে আর একবার (২০ দিন পরে) সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা : জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। সেই সাথে প্রতি বর্গমিটার এলাকায় ৬০-৭০টা চারা রেখে বাকি চারা উঠিয়ে দিতে হবে। বোনার ২ সপ্তাহ পরে এই কাজ করতে হবে।

রোগ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার :

অলটারনেরিয়া ব্লাইট : এই রোগে ডালে ও পাতায় চক্রাকার কালো দাগ দেখা দেয়। রোগগ্রস্ত গাছের শুঁটি থেকে ছোট কোঁকড়ান দানা পাওয়া যায়।

প্রতিকার ঃ ১। শোধন করা বীজ ব্যবহার। ২। প্রয়োজনে ডাইথেন এম-৪৫ জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা। ৩। আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে ফেলা।

ডাউনি মিলডিউ ঃ এই রোগে গাছে বিভিন্ন প্রকারের হলুদ দাগ দেখা দেয়। পরে এই দাগ গুটির আকার নেয় ও ভেতরে সাদা গুঁড়ো পাউডারে ভরা থাকে। এই রোগ পাতা. ডাল, ফুল ও ফল সব জায়গায় হয়। ফুল আক্রান্ত হলে পচে যায়। শুঁটি হয় না।

প্রতিকার ঃ ১। শোধন করা বীজ ব্যবহার। ২। জিনেব বা ক্যাবাথেন ০·১% ব্যবহার করা।

হোয়াইট ব্লিস্টার ঃ এই রোগ এলবুগো ক্যানডিডা নামক ছত্রাক থেকে হয়। এই রোগ মিলডিউ রোগের সাথেও দেখা যায়। এই রোগের চিহ্ন সাদা ফোস্কা ; পাতা, কাণ্ড, ডাল ও ফুলে দেখা দেয়। ফোস্কা ফেটে সাদা গুঁড়ো বের হয়। আক্রান্ত ফুল থেকে ফল হয় না।

প্রতিকার ঃ ১। শোধন করা বীজ ব্যবহার। ২। ০·২% ডাইফোলোটান ব্যবহার করতে হবে। ৩। ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

পোকা ঃ

করাত পোকা ঃ এই পোকা চারাগাছের সবথেকে বেশী ক্ষতি করে। পূর্ণাঙ্গ মাছি কমলা রঙের, মাথা কালো হয়। স্ত্রী মাছির ডিম পাড়ার অঙ্গ করাতের মত বলে এর নাম 'করাত মাছি'—এদের শূককীট পাতা খায় ও পাতার শিরা ছাড়া আর কিছুই থাকে না, এরা আশ্বিন মাস পর্যন্ত থাকে। শীত পড়লে আর দেখা যায় না।

প্রতিকার ঃ বি এইচ. সি. ১০% গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেই এদের দমন করা যায়।

জাবপোকা ঃ টোরি বা তারামিরা জলদি জাতের ফসল বলে জাবপোকা জমিতে লাগার আগেই আক্রান্ত হবার সময় পার হয়ে যায়। সেইজন্য জাবপোকা খুব ক্ষতি করতে পারে না। তবে

দেরীতে লাগলে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এই পোকা গাছের রস খেয়ে পাতা ফুল, ফল, সব শুকিয়ে দেয়। পরে গাছ মরে যায়। জাবপোকাই সরষের সবথেকে বেশী ক্ষতি করে।

প্রতিকার : ১। ঠাণ্ডা ও মেঘলা আবহাওয়া এই পোকার বংশ-বৃদ্ধির সহায়ক। এইজন্য আগাম লাগান ফসল এই পোকার আক্রমণ থেকে বেঁচে যেতে পারে।

২। ডিমেক্রন বা মেটাসিসটক্স বা রোগর ব্যবহার করলে পোকার দমন সম্ভব হয়।

পেন্টেড বাগ : এই পোকা দেখতে কালো এবং ডানায় কমলা ও লাল দাগ থাকে। এরা পাতা, ফুল, ফলকে আক্রমণ করে। গাছ ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে মরে যায়।

প্রতিকার : ১। বি. এইচ সি. ১০% গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে পোকা দমন করা যায়।

২। ডিমেক্রন, মেটাসিসটক্স বা রোগর জাতীয় ওষুধ দিলে খুব ভাল ফল দেয়।

ফসল কাটা ও ঝাড়াই করা ঃ

যখন শুঁটি হলুদ রঙ নেয় তখন বুঝতে হবে যে ফসল কাটার উপযুক্ত হয়েছে। সরষে সকালে কাটা ভাল। কারণ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশিরে ভেজা গাছ শুকনো হয়ে যায় আর দানা ঝরে পড়ে। ফসল কেটে ৭-৮ দিন জাঁক দিয়ে রাখতে হয় পরে পিটিয়ে বীজ বের করে নিতে হয়। কুলোয় ঝাড়া বীজ ভাল করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।

ফলন : ভাল জাতের বীজ লাগালে টোরী বা তারামিরা হেক্টরে ১২-২৪ কুইন্টাল ও রাই সরষে ২০ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন দেবার ক্ষমতা রাখে।

নাইজার বা সরগুজা

নাইজার (গুইগোসিয়া এবিশিনিকা) একটি অভোজ্য তেল উৎপাদনকারী ফসল। ইহা সাম্প্রতিক কালে ভারতে আমদানী করা হয়। ইহা আফ্রিকা মহাদেশ বিশেষ করে ইথিওপিয়ার আদি ফসল। এই তেল পূজার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া সাবান, রং তৈরী ও যন্ত্রপাতিতে দেবার জন্য সরগুজার তেল ব্যবহার করা হয়। সরগুজার বীজ থেকে ৪৩% তেল পাওয়া যায়। এই তেল বৃটেন, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও ইতালীতে পাঠান হয়। তা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। সরগুজা খইল গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

আদিনিবাস ও ভারতে আগমন ঃ

এলাকা ও বিস্তার ঃ ভারতে প্রায় ৪·৮ লক্ষ হেক্টরে সরগুজার চাষ হয় ; এবং ফলন প্রায় ১·২ লক্ষ টন। ভারত এই চাষে বিশ্বের শীর্ষ-স্থানে আছে। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা এবং তামিলনাড়ুতে সবথেকে বেশী চাষ হয়।

গাছের বিবরণ ঃ

আবহাওয়া ঃ সরগুজা বর্ষাকালীন ফসল। এই কারণে বৃষ্টিপাত-বহুল এলাকায় এই ফসলের চাষ করা হয়।

মাটি ঃ এই ফসল যে কোন প্রকারের মাটিতে করা যায়। তবে এঁটেল মাটিতে ভাল জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকলে সে জমিতে সরগুজার চাষ করা উচিত নয়। লাল মাটি অঞ্চলে ও দো-আঁশ মাটিতে সরগুজার ভাল ফলন পাওয়া যায়।

জমি তৈরী ঃ ৩-৪ বার লাঙ্গল দিয়ে মাটি উলটিয়ে আগাছা মারতে হবে। এই ফসল বর্ষাকালীন। তাই আগাছামুক্ত জমি

না হলে ফসলের উৎপাদন কম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সম্ভব হলে ১০০-১৫০ কুইন্টাল জৈব সার শেষ চাষের আগে দিতে হবে।

বীজের হার: হেক্টর প্রতি ৭-৮ কেজি শোধন করা উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করা ভাল।



সরগুজা (নাইজার)

বোনার সময়: আষাঢ় থেকে শ্রাবণ মাসের মধ্যে বুনতে হবে। সরগুজা মিশ্র ফসল হিসাবে বোনা যায়। সাধারণতঃ জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসাবে বোনা হয়। উন্নত বীজ—জি-এ. ২ ও জি. এ-১০।

বীজ বপন: সারিতে বোনাই সব থেকে ভাল। কারণ সাথী ফসল লাগাতে হলে সারির মধ্যে সাথী ফসল বোনা চলে। প্রতি সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং সারিতে ১৫ সেমি অন্তর বীজ বুনতে হবে।

সার প্রয়োগ: উর্বর জমিতে সার প্রয়োগ না করলেও চলে। তবে হেক্টর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন ২০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ শেষ চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। যেহেতু

এই ফসল মাত্র ৯০ দিনের মধ্যে কাটা হয় সেই কারণে কোন চাপান সার প্রয়োগ না করলেও হয়।

পরিচর্যাঃ বর্ষাকালীন ফসল বলে জমিতে আগাছা বেশী হয়। জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজনে দুবার নিড়ানী দিতে হবে।

রোগ পোকাঃ নাইজার বা বা সরগুজায় রোগ পোকার আক্রমণ খুব একটা হয় না। হলে সরষের মত প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

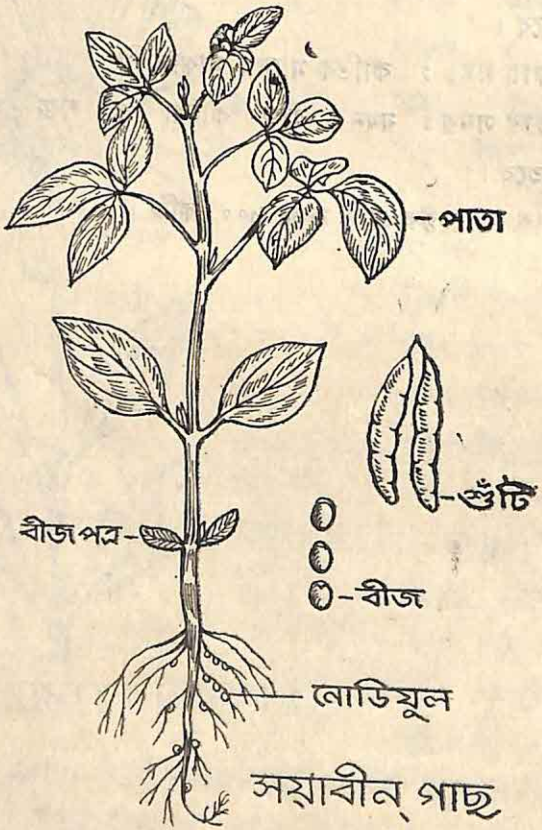
পাকার সময়ঃ কার্তিক মাসের মাঝামাঝি।

কাটার সময়ঃ যখন বীজ কালো ও শক্ত হয়, তখন কাটতে হবে।

ফলনঃ হেক্টর প্রতি ফলন ৬০০ কেজি।

সয়াবিন

সয়াবিন একটি পুষ্টিকর খাদ্য। সয়াবিনে ২০ ভাগ তেল ছাড়াও ৪০% প্রোটিন আছে। এবং জৈব প্রোটিনের অংশ সবথেকে বেশী এই বীজে পাওয়া যায় তাছাড়াও সয়াবীনে প্রচুর পরিমাণে লাইসিন



সয়াবীন গাছ

(৫%), খনিজ নুন এবং ভিটামিন আছে। সয়াবিন তেল রান্না এবং মুখরোচক খাবার তৈরী করবার জন্য ব্যবহার করা হয়। সয়াবিনের দুধ, দই, মাংস পকোড়া ইত্যাদি এখন প্রতি ঘরেই ব্যবহার করা হয়।

আদিনিবাস ও ভারতে আগমন ঃ

উৎপত্তি ও ইতিহাস ঃ চীনদেশে প্রথম সয়াবীনের ব্যবহার শুরু হয়। চীনের চিকিৎসা বিদ্যার পুস্তকে সয়াবীনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতে কবে সয়াবীনের আগমন হয়েছে তার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে বেশ কয়েক শতাব্দী আগেই দক্ষিণ ভারতে এর চাষ হয়।

১৯৬৩ সালে আবার সয়াবীন নিয়ে গবেষণা শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সালে কৃষি গবেষণা পরিষদ সয়াবীন চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

গাছের বিবরণ ঃ

মাটি ঃ সয়াবীনের জন্য উর্বর মাটি প্রয়োজন। তবে জলনিকাশের সুবিধা আছে এরকম বেলে দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটিতে সবথেকে ভাল ফলন পাওয়া যায়। লবণাক্ত বা ক্ষার মাটিতে সয়াবীন হয় না। সামান্য অম্ল জমিতে সয়াবীন চাষ করতে হলে আগে চুন বা ঐ জাতীয় পদার্থ এক মাস আগে মাটিতে দিয়ে নিতে হবে।

ফসল পরিক্রমা ঃ সয়াবীনের সাথে গম, আলু ছোলা, তামাক ইত্যাদির চাষ করা যায়।

সয়াবীন—গম
সয়াবীন—আলু
সয়াবীন—আগাম আলু/গম,
সয়াবীন—ছোলা/তামাক (উত্তরবঙ্গের জন্য)

বীজের জাত :

সয়াম্যাক্স ঃ ছড়ান শাখাবহুল ও ছড়ান লম্বা গাছ। বর্ষাকালে ফুল আসার পর ক্রমশঃ লতিয়ে যায়। ফুলের রং বেগুনি, বীজের আকার ছোট ও রঙ হালকা সবুজ। আষাঢ় মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত লাগান যায়, আষাঢ় মাসে লাগালে পাকতে ১২৫-১৩০ দিন লাগে। তবে দেরীতেলাগালে পাকে তাড়াতাড়ি।

ভাদ্র মাসে লাগালে পাকতে মাত্র ৯০ দিন সময় নেয়। ফলন হেক্টরে ২০-২২ কুইন্টাল। বীজে ৪৩ ভাগ প্রোটিন ও ১৮ ভাগ তেল আছে।

আর-১৮৪ : শাখাবহুল, মাঝারি ধরনের গাছ। বর্ষাকালে লাগালে গাছের ঝাড় বেশী হলেও দাঁড়িয়ে থাকে। ফুলের রঙ হালকা বেগুনি। বীজের রঙ হালকা হলুদ ও আকারে ছোট। আষাঢ় মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত লাগান চলে। তবে আষাঢ় মাসের শেষ থেকে শ্রাবণ মাসের প্রথমে লাগালে বেশী ফলন পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসে লাগালে পাকতে ১২৫-১৩০ দিন সময় লাগে ও দেরীতে বুনলে পাকার মেয়াদ ক্রমশ কমতে থাকে। ভাদ্র মাসে লাগালে ৯০ দিনে পাকে। ফলন হেক্টর প্রতি ২৩-২৫ কুইন্টাল। বীজে শতকরা ৪২ ভাগ প্রোটিন ও ১৬% তেল থাকে।

ডি. এস. ৭৩-১৬ : অল্প শাখাযুক্ত। চাপা ও খাড়া ধরনের গাছ। ফুলের রঙ সাদা। বীজের রঙ ফিকে হলুদ এবং আকারে বড়। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ অবধি লাগান চলে। তবে আষাঢ় মাসের শেষে ও ভাদ্র মাসের প্রথমে লাগালেও ফলন কম হয় না। এই জাত শীতকালে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে বুনলে চলে। বর্ষাকালে ৯০-১২০ দিন লাগে এবং শীতকালে ১১০-১২০ দিনে পাকে। খরিফ খন্দে ফলন ১৮-২০ কুইন্টাল এবং শীত-কালে ১৪-১৬ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন দেয়।

জে. এস-২ : অল্প শাখাযুক্ত গাছ বেঁটে। ফুলের রঙ সাদা। আষাঢ় মাসে বোনার উপযুক্ত। শ্রাবণ মাসে বোনা হলে তবে ফলন কম হয়। পাকতে ৮৫ থেকে ১০০ দিন লাগে। এই জাত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের পক্ষে উপযুক্ত। ফলন ১৬-২০ কুইন্টাল পর্যন্ত পাওয়া যায়।

ইউ. পি. এস্. এম-১৯—অল্প শাখাযুক্ত। চাপা ও খাড়া ধরনের গাছ। গাছ বেঁটে ও ফুলের রং হালকা বেগুনি। বীজের আকার মাঝারি। রঙ ফিকে হলুদ, আষাঢ় মাসে বোনার উপযুক্ত, যদিও

শ্রাবণ মাসের শেষ অবধি বোনা যেতে পারে। দেরীতে বুনলে গাছ বেঁটে হয়। শুঁটি কম ধরে ও ফলন কম হয়। বোনার এদিক-ওদিক হলে পাকতে ৮৫-১০০ দিন সময় নেয়। ফলন হেক্টর প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল খরিফখন্দে কাঁকুড়ে মাটি অঞ্চলে ধানের সাথে মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা যায়।

অঙ্কুর : শাখাবহুল চাপা গাছ, লম্বা ও খাড়া ধরনের। ফুলের রঙ সাদা। বীজের আকার ছোট ও রঙ ফিকে হলুদ। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি বোনার উপযুক্ত সময়। পাকতে প্রায় ১৩৫ দিন লাগে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল, পাহাড়ী অঞ্চলে খরিফখন্দে চাষ করা যায়। মরচে রোগ প্রতিরোধক্ষম।

ক্লার্ক-৬৩ : অল্প শাখাযুক্ত চাপা ও খাড়া ধরনের গাছ। গাছ বেঁটে, ফুলের রং সাদা। বীজের আকার বড় ও রং ফিকে হলুদ। প্রাক খরিফ মরশুমে চাষের জন্য ফাল্গুনের মাঝামাঝি লাগানোর উপযুক্ত সময়। ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহের পর বোনা উচিত নয়। কারণ বীজ পাকার সময় বৃষ্টি হয়। পাকতে ৯০-৯৫ দিন সময় নেয়। ফলন হেক্টরে ২০ কুইন্টাল।

বোনার সময় : খরিফ মরশুমে বোনার সময় আষাঢ় মাস, উত্তরবঙ্গে জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় বোনা ভাল। পাট কেটে শ্রাবণ মাসে লাগিয়ে পরে ঐ জমিতে গম লাগান যায়।

বীজের হার : সারিতে বুনলে ৫০-৭০ কেজি শোধন করা বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি কেজি বীজে ৪-৫ গ্রাম থাইরাম দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

সার প্রয়োগ : চাষ দেওয়ার সময় জমিতে ২০ টন খামার আবর্জনা সার বা কম্পোস্ট সার প্রাথমিক সার হিসাবে দিতে হবে। সয়াবীন শুঁটি জাতীয় ফসল। সেই কারণে মুক্ত নাইট্রোজেনও জমিতে সংগ্রহ করে এবং জমির খাদ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই

খুব বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন সার দেবার প্রয়োজন হয় না। হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি নাইট্রোজেন ৮০ কেজি ফসফেট সার ও ৬০ কেজি পটাশ সার শেষ চাষের সময় মাটিতে দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে সবথেকে ভাল হয় যদি এই সার বীজ থেকে ৭ সেমি দূরে ও ৭ সেমি গভীরে দেওয়া যায়। বীজ বোনার আগে **রাইজোবিয়াম জাপানিকাম** বীজে ভাল করে লাগিয়ে নিতে হবে। রাইজোবিয়াম লাগাবার পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল ঃ

১। বোনার আগে বীজ কিছু সময় জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে জল ফেলে দিতে হবে।

২। ২½ লিটার পরিষ্কার জলে ৪০০ গ্রাম চিটে গুড় মিশিয়ে আধ ঘণ্টার মতন ফোটাতে হবে। ফোটান হলে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে।

৩। এইবার গুড়ের দ্রবণের মধ্যে এক কেজি জীবাণু সার ভাল করে নেড়ে নিতে হবে। এইবার প্রয়োজনীয় বীজ এই দ্রবণে মিশিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে।

৪। ছায়ায় বীজ শুকিয়ে নিতে হবে।

বীজ বপন ঃ বেশী ফলন ও পরিচর্যার সুবিধার জন্য সারিতে বীজ বোনাই ভাল। গাছের দূরত্ব কি রকম হবে তা নীচে দেওয়া হল ঃ

প্রাক খরিফ	২৫ সেমি × ৫ সেমি
খরিফ	৩০ সেমি × ১০ সেমি
পশ্চাৎ খরিফ	২৫ সেমি × ১০ সেমি
রবি বা শীতকালীন	২৫ সেমি × ৫ সেমি

পরিচর্যা ঃ বীজ লাগাবার ১৫ দিন পরে প্রতি বর্গমিটার জায়গায় নিম্নলিখিত চারা রেখে বাকী চারা উঠিয়ে ফেলতে হবে। সেই সাথে মাটি কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। হালকা

জমি না কুপালেও চলে। পরে চাকা নিড়ানী দিয়ে পনের দিন পরে দুবার নিড়ানী দিতে হবে।

১। প্রাক খরিফ ও রবি মরশুমে—৮০টি
২। খরিফ —৩৩টি
৩। পশ্চাৎ খরিফ —৪০টি

সেচ : খরিফ খন্দে সেচের কোন প্রয়োজন হয় না। তবে প্রাক খরিফ ও রবি খন্দে বীজ বোনার আগে ফুল আসার আগে ও বীজ দানা বাধার সময় একবার করে সেচ দেবার দরকার হয়।

শস্যরক্ষা ও প্রতিকার

শস্যরক্ষা : গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। পাতায় বাদামী দাগ ধরা রোগ দেখা দিলে ব্লাইটক্স ৫০ বা ফাইটোলন ৪ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে ছেটাতে হবে। হেকটর প্রতি ৬৫০ লিটার ওষুধ গোলা জল লাগবে। কুটে রোগ দমনের জন্য রোগগ্রস্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। তাছাড়া রোগর জাতীয় ওষুধ প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ছেটাতে হবে। হেক্টর প্রতি ৬৫০ লিটার মিশ্রণ লাগবে। শুঁয়ো বা বিছা পোকা আক্রমণে মেটাসিড জাতীয় ওষুধ উপরোক্ত হারে ছড়াতে হবে।

ফসল কাটা : শুঁটি পেকে গেলে হালকা হলুদ রং ধরবে। পাতা ঝরতে শুরু করবে, এই অবস্থায় ফসল কাটার উপযুক্ত সময়।

—০—